# তাওহীদের ডাক

৬৮ তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২৪
www.tawheederdak.com

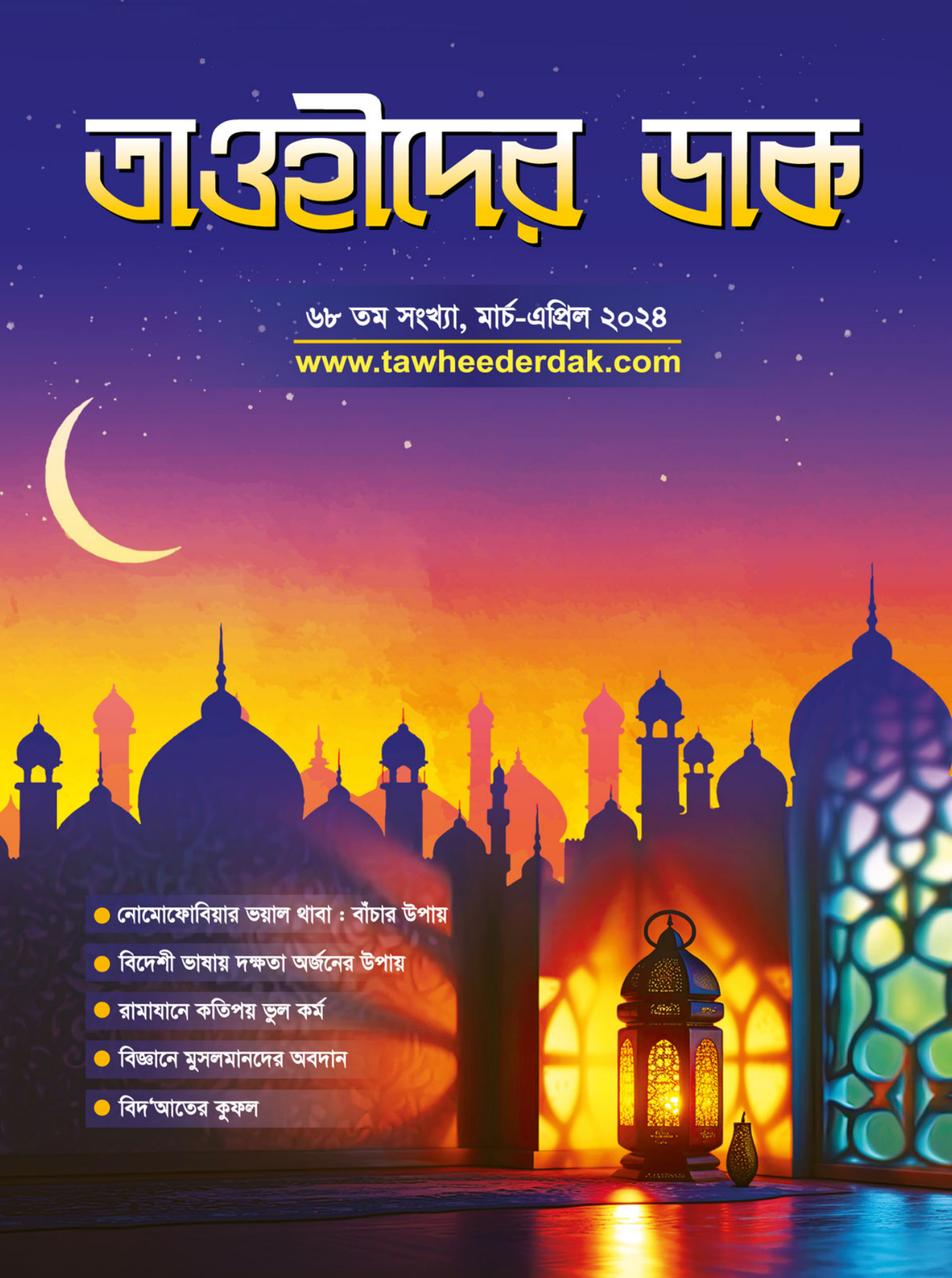

- নোমোফোবিয়ার ভয়াল থাবা : বাঁচার উপায়
- বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের উপায়
- রামাযানে কতিপয় ভুল কর্ম
- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান
- বিদ'আতের কুফল

# মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

**আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন!** নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

## অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

## ছিয়াম ও ক্বিয়াম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

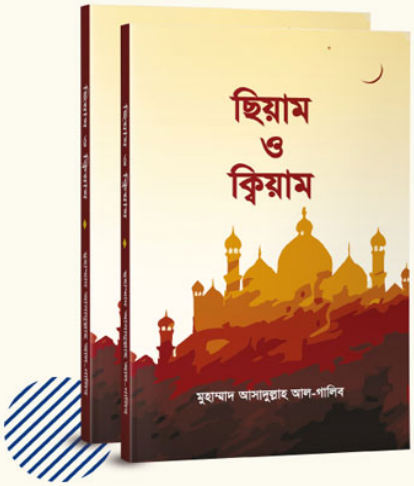


## হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

## বিবাহ পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

# তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৬৮ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২৪

**উপদেষ্টা সম্পাদক**
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

**সম্পাদক**
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

**নির্বাহী সম্পাদক**
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**সহকারী সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

**যোগাযোগ**
**তাওহীদের ডাক**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
**মোবাইল :** ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
**সার্কুলেশন বিভাগ**
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
**ই-মেইল**
tawheederdak@gmail.com
**ওয়েবসাইট**
www.tawheederdak.com

**মূল্য : ৩০ টাকা**

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


- **সম্পাদকীয়** ২
  শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াল দশা : আমাদের করণীয়
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪
  মৃত্যুকে স্মরণ
- **তাবলীগ** ৬
  **বিদ'আতের কুফল**
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** ১০
  **রামাযান ও ছিয়ামের কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি**
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তাজদীদে মিল্লাত** ১৪
  **ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন (শেষ কিস্তি)**
  আশরাফুল ইসলাম
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে** ১৭
  **সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি (শেষ কিস্তি)**
  অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী
- **চিন্তাধারা** ২০
  **নোমোফোবিয়ার ভয়াল থাবা ও বাঁচার উপায়**
  শো'আইব বিন আসাদ
- **ধর্ম ও সমাজ** ২২
  **মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য**
  সারোয়ার মেছবাহ
- **তারুণ্যের ভাবনা** ২৫
  **বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান**
  সাইফুর রহমান
- **শিক্ষাঙ্গন** ২৮
  **বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের উপায়**
  ওমর ফারূক
- **সমকালীন মনীষী** ৩২
  **ড. ভি আব্দুর রহীম**
- **পরশ পাথর** ৩৪
  পিটার শ্যুট (জার্মানী)-এর ইসলাম গ্রহণ
- **অনুবাদ গল্প** ৩৫
  **দুর্বলতাই যখন শক্তি**
  মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৩৬
  আমার শ্রেষ্ঠ মা
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৮
- **শব্দজট** ৩৯
- **কুইজ** ৪০
- **সাধারণ জ্ঞান** ৪০

# সম্পাদকীয়

## শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াল দশা : আমাদের করণীয়

গত ২০০ বছর ধরে এদেশের সিংহভাগ মানুষের আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর আঘাত হানার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নাস্তিক্যবাদী যে চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে, তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হ'ল এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। বৃটিশদের চাকুরীজীবী, পেশাজীবী ও কেরানী তৈরী করার লক্ষ্যে নিবেদিত ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দর্শনে পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থাও এদেশের আম জনমানসের শাখায়-প্রশাখায় এমনভাবে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনাদর্শকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় যেন নেই। স্বাধীনতার পর যতগুলো শিক্ষাক্রম এসেছে, প্রতিটি শিক্ষাক্রমেই একটু একটু করে গেড়ে দেয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বীজ, আর পাল্লা দিয়ে কমানো হয়েছে মুসলিম হিসাবে আত্মপরিচয় গঠনের সুযোগগুলো।

এই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এদেশের মুসলমানদের আত্মপরিচয় গঠনের মূলে আরো এক গভীর কুঠারাঘাত। এতদিন ইসলামী শিক্ষার নামে যৎসামান্য কিছু শেখার ব্যবস্থা থাকলেও নতুন শিক্ষাক্রমে 'ইসলামী শিক্ষা' নামে কোন বিষয় নেই। এর পরিবর্তে 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' নামক যে বিষয়টি রয়েছে, সেটিও আবার দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষার তালিকায় নেই। ২০১৩ সালে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টির নামকরণ যখন 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' করা হয়, তখন সম্ভবত পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভেবেই রাখা হয়েছিল, যা এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। অপরদিকে কলেজে ২০১২ শিক্ষাক্রম থেকেই 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। কেবল মানবিক বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা নিয়ে কারসাজির এই ধারাবাহিকতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, কিভাবে পাঠ্যসূচী থেকে ইসলাম শিক্ষাকে স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করা যায়–সেটাই নেপথ্যের কুশীলবদের মূল লক্ষ্য।

অপরদিকে স্বয়ং সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাতেই এখন ইসলামী শিক্ষার বিপণ্ন অবস্থা। ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি লালনই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য, সেখানেই এখন ইবতেদায়ী শ্রেণীতে সালামের পরিবর্তে শেখানো হচ্ছে 'গুড মর্নিং'। 'ইসলামের ইতিহাস' বিষয়টি এখন আর সিলেবাসেই নেই। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে একই মানে নিয়ে আসতে ১৯৮৫ সালে দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসির সমমান প্রদান করা হয়। কিন্তু তাতে মাদ্রাসার মূল সিলেবাসে হাত দেয়া হয়নি। অথচ বর্তমানে স্কুল ও মাদ্রাসার সিলেবাস সমন্বয় করতে গিয়ে মাদ্রাসা এবং স্কুলের মধ্যকার পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রায় হারিয়েই যাচ্ছে। স্কুলের সিলেবাসের সমস্ত বই মাদ্রাসার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এসকল মাদ্রাসায় পড়ে কেউ ভালো আলেম হ'তে পারবে–এ কথা খোদ আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররাও বিশ্বাস করে না। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে ২০০৬ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র অধীনে ফাযিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্স সমমান দিয়েছিল। অতঃপর ২০১৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মাধ্যমে সারা দেশের ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সরকারীভাবে ঘোষণা আসে কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্স সমমান প্রদানের। তবে এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য যে মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন নয়; বরং রাজনৈতিক মতলবপ্রসূত, তা তাদের ধারাবাহিক কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট। লর্ড মেকলেরা ইংরেজ শাসনামলেও যা করেননি, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তা কর্যকর করেছে। এ এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যার সাথে আমাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যোবোধের কোন সম্পর্ক নেই।

দুঃখের বিষয় হ'ল- কেবল ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়নকল্পে কোন সরকারের পক্ষ থেকে একটি যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ আমাদের নযরে আসেনি। অবকাঠামো খাতে সরকারের বিশাল ব্যয় দেখে আমরা আনন্দিত হই। স্কুল-কলেজের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিশাল বরাদ্দ দেয়া হয়। কোটি কোটি টাকা সেখানে ব্যয় হয়। তবে দিনশেষে সেটা হয় একদল মানুষের স্বার্থে; যারা দুর্নীতির মচ্ছবে লিপ্ত হয়ে কাড়ি কাড়ি অর্থ হাতিয়ে নেয়। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়। আর সেটাই হয়ে যায় আমাদের উন্নয়নের মাপকাঠি।

অথচ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কোন বরাদ্দ কিংবা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য গবেষণামূলক কোন উচ্চতর প্রতিষ্ঠান আমাদের নযরে আসেনি। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত কোন কমিশনও গঠন করা হয় না। এক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা তো দূরের কথা, কোন বিনিয়োগই নেই! এমনকি সরকার নিজেও বোধহয় জানে না যে, শিক্ষার নামে দেশে আসলে কী নৈরাজ্য চলছে। ফলে শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে দেশব্যাপী সমালোচনা শুরু হ'লে কেউ এর দায়দায়িত্ব নিতে চায় না। একে অপরকে দায়ী করার মধ্যখান থেকে বাস্তবায়ন হয়ে যায় আড়ালের কুশীলবদের গভীর ষড়যন্ত্র। এত বিশৃংখল শিক্ষাব্যবস্থাপনা পৃথিবীর আর কোন একটি দেশেও আছে কি-না সন্দেহ। সরকারী কিংবা এমপিওভুক্ত অনার্স, মাস্টার্স স্তরের ৮২০টি কলেজ বর্তমানে রয়েছে। এগুলোর একমাত্র কাজ সার্টিফিকেট প্রদান করা। সেখানে কোন পড়াশোনা নেই বললেই চলে। শিক্ষক-ছাত্র কেউ ক্লাসে উপস্থিত হয় না। যা হয়, তা স্রেফ দায়সারা গোছের। শিক্ষিত জাতি গড়ার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের থাক, শিক্ষার ন্যূনতম কোন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টাও সেখানে অনুপস্থিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক এক জরিপ রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশে অলস সময় পার করছেন ৩৯ শতাংশ তরুণ। এর বাস্তবতা আমরা অনার্স কলেজগুলো দেখলেই অনুধাবন করতে পারি। দেশের উপযেলা, ইউনিয়ন লেভেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ রয়েছে, তার প্রায় শতভাগেই ক্লাস করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ক্লাসে আসা-না আসা শিক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। পরীক্ষা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় আয় করে এবং শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পায়। অনার্স/মাস্টার্স পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা এতটুকুই জানে যে, তারা অমুক বিষয়ে পড়েছে। কিন্তু কী শিখেছে তা তারা জানে না। আর সার্টিফিকেট থাকায় কিছু যে শিখেনি তা-ও বলতে পারে না। আবার সার্টিফিকেট থাকার কারণে তারা 'ছোটখাটো' কাজও করতে চায় না। কেবল অফিসার হ'তে চায়, যার যোগ্যতা তার নেই। সেকারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল সার্টিফিকেটধারী বেকার তৈরীর কারখানা বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

অপরদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিষয়ের পড়া পড়ে না। বরং তারা তাদের সমস্ত মেধা ও শক্তি ব্যয় করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য। সেজন্য দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীও সেভাবে তৈরী হচ্ছে না। মাদ্রাসাগুলো ফাযিল ও কামিলের নামে যা হচ্ছে, তা স্রেফ প্রহসন।

চোখের সামনে সবকিছু চলছে, কিন্তু এই অচল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ভীষণ উদার ও সহানুভূতিশীল। এ ব্যাপারে তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ঠুনকো বিষয় নিয়েও এদেশে মিছিল-মিটিং দিনরাত চলমান থাকলেও জাতির এই নীরব অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কারো কোন মিছিল-মিটিং দেখা যায় না। না শিক্ষকদের পক্ষ থেকে, না শিক্ষার্থীদের। এভাবে মাস শেষে শিক্ষকদের বেতন গোনা আর বছর শেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট ফী প্রদানের বিপরীতে অনার্স-মাস্টার্স সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এদেশের অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থা।

দায়িত্বহীন শিক্ষক—শব্দবন্ধটি বাংলাদেশের মত এত প্রাসঙ্গিক বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। মানুষ গড়ার রক্ষক হয়ে কিভাবে ভক্ষক হয়ে যান, কিভাবে নিজের রুটি-রুযী ঠিক রাখতে অবলীলায় জাতির ভবিষ্যতের বিনাশ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত বোধহয় কেবল বাংলাদেশই। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা গোল্লায় যাক, তাতে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ছাপোশা কেরানীর মত তাদের নযর কেবল প্রমোশন আর বেতন বৃদ্ধির খবরে। জাতি গঠনের সামান্যতম দায়ও যেন তারা বোধ করেন না। ফলে সমাজ গড়ার কারিগরদের নামই এখন বেশী আসে দুর্নীতি ও অপকর্মের হোতাদের তালিকায়।

এদেশের ব্যবসায়ীরাও শিক্ষার উন্নয়নে বিনিয়োগ করেন না, বরং রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বিদেশে টাকা পাচার করাই তাদের কামিয়াবীর দর্শন। নতুবা খেলাধুলা আর বিনোদনে যেভাবে তারা দেদারছে অর্থ বিলান, শিক্ষার উন্নয়নে সেরূপ কোন উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়ে না। কখনও শোনা যায়নি যে, গবেষণার জন্য কোন শিল্প গোষ্ঠী বড় কোন বরাদ্দ দিয়েছেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যাকাতের টাকা থেকে কিছু বরাদ্দ রেখেই তারা তাদের দায়িত্ব শেষ মনে করেন। ফলে এদেশে উন্নয়নের মহড়া আছে, কিন্তু বাস্তবে কিছু নেই। দেশে কোন মেধাবী টেক জায়ান্ট নেই, বিজনেস জায়ান্ট নেই, শিক্ষা জায়ান্ট নেই, বড় আলম বা বিদ্বান নেই। হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন কিংবা স্যার সলীমুল্লাহদের মত শিক্ষানুরাগী দানশীলদের কোন দেখা নেই। আছে কেবল ভাবধরা বুদ্ধিজীবী সমাজ। যাদের মুখনিঃসৃত জ্ঞান বিতরণ কেবল সেমিনার কক্ষেরই রওনক বৃদ্ধি করে, জাতির উন্নয়নে বিশেষ কাজে আসে না।

এদেশে শিক্ষার যা কিছু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তার পিছনে মূল অবদান বেসরকারী ও অনানুষ্ঠানিক খাতের। বেসরকারী স্কুল-মাদ্রাসাগুলো হাযারো বাধা-বিঘ্নতার মধ্যে সাধ্যমত এদেশের শিক্ষার উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কোচিং বাণিজ্য নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও মূলতঃ এদেশের শিক্ষাঙ্গনকে বলার মত অবস্থানে রেখেছে কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলোই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গাছাড়াভাবের মধ্যে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য শেষ ভরসা এই কোচিং সেন্টার। যেহেতু প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাই কোচিং সেন্টারে প্রথাগত নিয়োগবাণিজ্য নেই, সেরা শিক্ষক নির্বাচনেও দ্বিধা নেই। ফলে সেখানে দক্ষ, যোগ্য ও আন্তরিক শিক্ষক স্টাফ পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতামূলক সার্ভিস থাকায় আশানুরূপ যত্নও পায় শিক্ষার্থীরা। এভাবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়েছে কোচিং সেন্টার নির্ভর। প্রি-প্রাইমারী থেকে বিসিএস পর্যন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে কোচিং সেন্টারের প্রাসঙ্গিকতা। সুতরাং যত সমালোচনাই হোক, কোচিং সেন্টারই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে।

শিক্ষাব্যবস্থার এই গহীন অমানিশার মাঝেও আমরা নিরাশার ঘোরে সবকিছু হারাতে চাই না। বরং এর মধ্যেও আমরা কিছু আশার আলো দেখছি একারণে যে, আমাদের বৃহত্তর সংখ্যক অভিভাবকই এখন তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে মাদ্রাসায় পাঠানো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। এত যে নাস্তিক্যবাদী প্রচারণা চলমান রয়েছে, তবুও শিক্ষার্থীদের মাঝে বোরকা, হিজাব এবং দাঁড়ি রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এই চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে আমরা হতাশবাদী নই; বরং এ অবস্থা সামাল দিতে হলে আমরা কিছু করণীয় নির্ধারণ করতে চাই। যেমন –

১. সরকারীভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দেয়ার চিন্তা করা হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিৎ হবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়নব্যবস্থা চালু রাখা। কেননা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেয়া এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত, যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মনোভাব দূরীভূত করে তাদেরকে একটা লক্ষ্যহীন হযবরল অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। তবে গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে এমসিকিউ/বিষয়ভিত্তিক পরিষ্কার ধারণা, বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রভৃতি যাচাই মূলক প্রশ্ন রাখতে হবে।

২. ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা যরূরী, যেন দাখিল/এসএসসির মধ্যেই তারা পেশাগত লক্ষ্য স্থির করে ফেলে। গতানুগতিক অনার্স/ মাস্টার্স/বিসিএস-এর মত সময়সাপেক্ষ উচ্চাভিলাসী চিন্তার পিছনে না ছুটে প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে বাস্তবভিত্তিক হালাল রূযী উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যবসা/কারিগরী/টেকনিক্যাল প্রভৃতি সেক্টর এখন বিপুল সম্ভাবনাময় এবং কম সময়ক্ষেপনকারী। এজন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই 'ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং' বিভাগ থাকা আবশ্যক, যেন শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা যায়।

৩. শিক্ষার প্রতিটি স্তরে দ্বীন শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য বৈকালিক মক্তব/সাপ্তাহিক মক্তব/আফটার স্কুল মক্তব/অনলাইন পাঠশালা প্রভৃতি অনানুষ্ঠানিক ধারাগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে, তেমনি যুবক ও বৃদ্ধদের জন্যও প্রতিষ্ঠান, মসজিদ এবং অনলাইনভিত্তিক শিক্ষাধারাকে সহজলভ্য করতে হবে।

৪. অভিভাবকদের সচেতন করাও অতীব যরূরী, যেন শিক্ষাব্যবস্থার এই বিপর্যয় থেকে তারা সন্তানকে রক্ষার উদ্যোগ নেন। এজন্য সন্তানদের জন্য সঠিক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা যরূরী। প্রয়োজনে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য নিজেই উদ্যোগ নিতে হবে। সেটা সম্ভব না হলে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগগুলোর সাথে সন্তানকে বাধ্যতামূলক যুক্ত করে দিতে হবে।

৫. সর্বোপরি চলমান এই শিক্ষাক্রম বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং যুগোপযোগী শিক্ষার্থী গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

# মৃত্যুকে স্মরণ

**আল-কুরআনুল কারীম :**

١- كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

(১) 'কীভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮)*।

٢- اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ-

(২) 'আল্লাহ প্রাণীজগতের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুকালে এবং যে মরেনা তার নিদ্রাকালে। অতঃপর তিনি যার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন, তার প্রাণ আটকে দেন এবং অন্যগুলিকে ছেড়ে দেন নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। অবশ্যই এতে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(যুমার ৩৯/৪২)*।

٣- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ-

(৩) 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

٤- أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ-

(৪) 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*।

٥- وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

(৫) 'কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে খবর রাখেন' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

٦- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا-

(৬) 'আর ঐসব লোকদের কোন তওবা নেই, যারা মন্দকর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা কবুল হয় না ঐসব লোকের, যারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়। আমরা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৮)*।

٧- وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-

(৭) 'একই অছিয়ত করেছিল ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও। হে আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মরো না মুসলিম না হয়ে' *(বাক্বারাহ ২/১৩২)*।

٨- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-

(৮) হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

٩- الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ-

(৯) 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমলকারী? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/২)*।

**হাদীছের বাণী :**

١٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُوْلَئِكَ الْأَكْيَاسُ-

(১০) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক আনছারী ব্যক্তি এসে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা

করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন মুমিন সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে চরিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ। ছাহাবী বললেন, কোন মুমিন সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী কালের জন্য উত্তম প্রস্তুতি নেয়। তারাই হ'ল জ্ঞানী।[১]

১১- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِيْ ضِيْقٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ-

(১১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। কারণ যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে'।[২]

১২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، يَقُوْلُ: لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ-

(১২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন দিন আগে আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র প্রতি উত্তম ধারণা পোষণরত অবস্থায় ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে'।[৩]

১৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

(১৩) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস মাইয়েতের সাথে যায়। দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবার, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল'।[৪]

১৪- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِيْ، فَقَالَ: كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আমার দু'কাঁধ ধরে বললেন, 'তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী'। আর ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হ'লে আর সকালের অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে আর সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি নাও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও'।[৫]

১৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ-

(১৫) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা'হলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়'।[৬]

**মনীষীদের বক্তব্য :**

১. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তার হিংসা ও পাপ কমে যায়'।[৭]

১. রাগেব আসফাহানী (রহঃ) বলেন, 'মৃত্যুকে স্মরণ অতিরিক্ত কামনা-বাসনা দূর করে, আকাঙ্ক্ষার প্রবঞ্চনা হ্রাস করে, বিপদাপদকে হালকা করে দেয় এবং (স্রষ্টার) অবাধ্যতা ও ব্যক্তির মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়'।[৮]

২. আবু হামীদ আল-লাফফাফ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাকে তিনভাবে সম্মানিত করা হয় : দ্রুত তওবা, অল্প জীবিকায় পরিতুষ্টি এবং ইবাদতের উদ্যমতা'।[৯]

**সারবস্তু :**

১. মৃত্যু এমন এক সত্য বিষয় যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ২. সৎআমলের উপর মৃত্যুবরণ করা আখেরাতে মুক্তির শুভ লক্ষণ। ৩. সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে বড় উপায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে মৃত্যুর পূর্বে উত্তম প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯ 'মৃত্যুকে স্মরণ ও তার প্রস্তুতি' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।
২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৯৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩।
৩. মুসলিম হা/২৮৭৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৩৬।
৪. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬২; মিশকাত হা/৫১৬৭।
৫. বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪।
৬. বুখারী হা/৫৬৭১; মুসলিম হা/২৬৮২; মিশকাত হা/১৬০০।
৭. আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যুহদ ১১৭ পৃ.।
৮. আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ ২৩৯ পৃ.।
৯. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন ৪১ পৃ.।

# বিদ‘আতের কুফল

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

**উপস্থাপনা :** বিদ‘আত হ’ল সুন্নাতের বিপরীত। যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে সুন্নাত বলা হয়, সেহেতু সুন্নাতের পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ‘আত ইসলামী শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। সুতরাং বিদ‘আতের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। ফলে দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্ট সব কিছুই বিদ‘আত। বিদ‘আতের নানাবিধ কুফলতা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোকপাত করা হ’ল।

**(১) আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ :** বিদ‘আত করা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপের নামান্তর। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ– ‘আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটানোর জন্য বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না’ *(নাহল ১৬/১১৬)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যারা বিদ‘আত করে, যার কোন ভিত্তি ইসলামী শরী‘আতে নেই, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা নিজেদের মন মত আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে’।[১]

**(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরন খেয়ানতের অপবাদ :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا– ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে‘মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, مَن اِبْتَدَعَ فِيْ الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَيْسَ الْيَوْمَ دِيْنًا– ‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ‘আত সৃষ্টি করল এবং তাকে উত্তম মনে করল, সে যেন ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম’ *(মায়েদাহ ৫/৩)*। সুতরাং সে যুগে (রাসূল ছাঃ ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে) যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হবে না’।[২]

অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি বলেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– ‘আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যার হুকুম আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; অবশ্যই আমি তার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন; অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছি’।[৩]

আবু যার (রাঃ) বলেন, مَا تَرَكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِراً يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا– ‘আকাশে যে পাখি তার দু’ডানা ঝাপটায় তার জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন’।[৪]

অতএব যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উপর নাযিলকৃত রিসালাত পরিপূর্ণভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, সেহেতু তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে হবে। তাঁর সুন্নাতকে উপেক্ষা করে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করলে তাঁর উপর খিয়ানতের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

**(৩) ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা :** ছাহাবায়ে কেরাম উম্মতের সবচেয়ে তাক্বওয়াশীল ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। বিদ‘আতের মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়। যেমন-

(ক) ছাহাবায়ে কেরামকে অলস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে গাফেল মনে করা হয়। অর্থাৎ বিদ‘আতীরা যখন ইসলামী শরী‘আত বহির্ভূত কাজকে নেকীর উদ্দেশ্যে পালন করে থাকে, তখন বিশ্বাস করা হয় যে, ছাহাবায়ে কেরাম ঐ সমস্ত কাজগুলি ইবাদত হিসাবে পালন না করে তাঁদের অলসতা ও গাফিলতীর পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) ছাহাবায়ে কেরামকে অপূর্ণাঙ্গ ইবাদতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম যেহেতু যাবতীয় বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে

১. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৫৯১ পৃঃ।

২. আশরাফ ইবরাহীম কাতকাত, আল-বুরহানুল মুবীন ফিত তাছাদ্দী লিল বিদ্ই ওয়াল আবাতীল ১/৪২ পৃঃ।

৩. সিলসিলা ছহীহা হা/ ১৮০৩; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/১৩৮২৫, ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, ১৫ পৃঃ।

৪. মুসনাদে আহমাদ হা/২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১, ২১৩৯৯, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; ছহীহাহ হা/১৮০৩।

মুক্ত রেখেছিলেন, সেহেতু বিদ‘আতীদের নিকট ছাহাবায়ে কেরাম অপূর্ণাঙ্গ ইবাদতকারী হিসাবে বিবেচিত হয়।

(গ) অনুসরণীয় ইমাম ও বুযুর্গানে দ্বীনকে ছাহাবায়ে কেরামের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরামের কথা কিংবা আমল যাই থাক না কেন, বিদ‘আতীদের নিকট তাদের অনুসরণীয় ইমাম অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের কথাই প্রণিধানযোগ্য হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ– ‘তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে’।[৫] সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন, مَا لَمْ يَعْرِفْهُ الْبَدْرِيُّوْنَ فَلَيْسَ مِنَ الدِّيْنِ– ‘বদরী ছাহাবীগণ (দ্বীনের ব্যাপারে) যা জানত না তা দ্বীন নয়’।[৬]

আওযাঈ (রহঃ) বলেন, اَلْعِلْمُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا لَمْ يَجِئْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ– ‘(দ্বীনের ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের থেকে যা এসেছে তাই প্রকৃত ইলম, আর তাদের কোন একজনের থেকেও যা আসেনি তা ইলম নয়’।[৭]

শা‘বী (রহঃ) বলেন, مَا حَدَّثُوْكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوْا فِيْهِ بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ– ‘রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের থেকে তোমাকে যা তারা বলে তুমি তা গ্রহণ কর, আর যা তারা তাদের রায়ের ভিত্তিতে বলে তুমি তার উপর পেশাব কর’।[৮]

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, ‘গ্রহণযোগ্য সূত্রে রাসূল (ছাঃ) হ’তে যা এসেছে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী কর্তৃক যা ছহীহ প্রমাণিত হয়ে এসেছে তাই ইলম যা দ্বীন হিসাবে সাব্যস্ত। আর যা তাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যার কোন ভিত্তি তাদের (রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম) আনীত বিধানের মধ্যে নেই, তাই হচ্ছে বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতা’।[৯]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُوْلُوْنَ فِيْ كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُوْنَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوْا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلاَّ وَقَدْ بَادَرُوْا إِلَيْهَا– ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বলে, যে সকল কথা ও কর্ম ছাহাবায়ে কেরাম থেকে সাব্যস্ত নয়, তা বিদ‘আত। কেননা যদি তা (উক্ত কথা ও কর্ম) উত্তম হ’ত, তাহ’লে তাঁরা তা করতেন। কেননা তাঁরা যে কোন ধরণের ভালো কাজ না করে ছাড়বেন না’।[১০]

**(৪) ইসলামের উপর অপূর্ণাঙ্গতার অপবাদ আরোপ করা :** আল্লাহ তা‘আলা অহি-র মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জে আরাফার ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তিনি বিদায় হজ্জ পালন করেছিলেন তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا– ‘আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে‘মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই অহি-র বিধানের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে, যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বলেন, اَلْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُوْلُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ أَوْ مَقَالِهِ : إِنَّ الشَّرِيْعَةَ لَمْ تَتِمَّ، وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاءُ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ اِسْتِدْرَاكُهَا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعْتَقِدًا كَمَالَهَا وَتَمَامُهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَمْ يَبْتَدِعْ وَلاَ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهَا– ‘বিদ‘আতীদের কথা ও বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই (ইসলামী) শরী‘আত অপূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস অপূর্ণ রয়ে গেছে যা পালন করা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব। কেননা তারা (বিদ‘আতীরা) যদি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করত, তাহ’লে তারা বিদ‘আত করত না’।[১১] অতএব ভাল কাজের দোহাই দিয়ে পূর্ণাঙ্গ এই দ্বীনের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন বিধান জারী করলে দ্বীন-ইসলামের উপরে অপূর্ণাঙ্গতার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়।

**(৫) ইসলামী শরী‘আতকে ধ্বংসকরণ :** বিদ‘আত ইসলামী শরী‘আতের মধ্যে কোন কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে তা ধ্বংসের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ لِمُنَاقَضَتِهَا الدِّيْنِ وَدَفْعِهَا لِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُوْلَهُ وَصَاحِبُهَا لاَ يَتُوْبُ مِنْهَا وَلاَ يَرْجِعُ عَنْهَا بَلْ يَدْعُوْ الْخَلْقَ

---

৫. তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

৬. ইবনু আব্দুল বার্র, জামেউ বায়ানি ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১৮১০ পৃঃ।

৭. তদেব।

৮. মুল্লা আলী ক্বারী, শাম্মুল আওয়ারেয ফী যাম্মির রাওয়াফেয ১/১৪৫।

৯. জামেউ বায়ানি ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১৮১০ পৃঃ।

১০. তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/১৫৭ পৃঃ; সূরা আহকাফ ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১. আবু ইসহাক আশ-শাত্বেবী, আল-ই‘তিছাম ১/৪৯ পৃঃ।

إِلَيْهَا وَلِتَضَمُّنِهَا الْقَوْلُ عَلَى اللهِ بِلاَ عِلْمٍ– ‘শয়তানের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হ’ল বিদ‘আত। কেননা তা দ্বীনকে ধ্বংস করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্র প্রেরিত বিধানকে নিষেধ করে। বিদ‘আতকারী কখনও তা থেকে তওবা করে না এবং তা থেকে ফিরে আসে না। বরং আল্লাহ সম্পর্কে ইলম বিহীন কথার মাধ্যমে মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে ও তার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে’।[১২]

**(৬) বিদ‘আত অন্তরকে কলুষিত করে :** মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদ‘আতের আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং সুন্নাতের অনুসরণকে যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করে না, ঠিক তখনই মানুষের অন্তর ইসলাম ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ড দ্বারা কলুষিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই (ইসলামী) শরী‘আতের বিধানসমূহ অন্তরের খাদ্য। কিন্তু যখন বিদ‘আত অন্তরের খাদ্য হয় তখন সেখানে সুন্নাতের জন্য অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। বরং তা নিকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণের স্থলাভিষিক্ত হয়’।[১৩]

**(৭) বিদ‘আতীর আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না :** মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে ইবাদত কবুলের অন্যতম একটি শর্ত হ’ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করা। যখন ইবাদত সুন্নাত পরিপন্থী হয় তখন তা বিদ‘আতী আমলে পরিণত হয়, যা আল্লাহ তা‘আলার নিকটে কবুল হয় না। যদিও মানুষ সেই আমলকে অত্যন্ত ভালো মনে করেই পালন করে থাকে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا– ‘বল, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ– ‘যে ব্যক্তি আমাদের এই শরী‘আতের মধ্যে নতুন এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার (শরী‘আতের) অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৫]

**(৮) তওবা কবুল না হওয়া :** আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে তওবা কবুলের শর্ত হ’ল, (১) সংশ্লিষ্ট পাপ কাজ বর্জন করা। (২) কৃত পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। (৩) পরবর্তীতে কখনও এই পাপে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করা। অতএব যেহেতু বিদ‘আতীরা বিদ‘আতকে ভালো আমল হিসাবে পালন করে থাকে, সেহেতু তারা উক্ত গর্হিত পাপ থেকে বিরত থাকে না। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لاَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا ‘ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদ‘আত অধিক প্রিয়। কেননা পাপ থেকে মানুষ তওবা করে কিন্তু বিদ‘আত থেকে তওবা করে না (কেননা সে বিদ‘আতকে ভালো কাজ বলে বিশ্বাস করে)’।[১৬]

আর বিদ‘আতকে বর্জন না করা পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতীর তওবা কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদ‘আত থেকে বিরত না হয়’।[১৭]

**(৯) হাউযে কাউছার ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত :** ক্বিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় কঠিনতম দিনে যখন হাউযে কাউছারের পানি ব্যতীত কোন পানি থাকবে না, সেদিন প্রত্যেক বিদ‘আতীকে সেই হাউযে কাউছারের নিকট থেকে বিতাড়িত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউযে কাউছার) নিকটে পৌঁছে যাবে। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক দূর হোক (আল্লাহ্র রহমত থেকে), যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে’।[১৮]

**(১০) বিদ‘আতের দিকে আহ্বানকারী অন্যের পাপের অংশীদার হবে :** যারা মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা অন্যের পাপের অংশীদার হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لِيَحْمِلُوْا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ– ‘ক্বিয়ামত দিবসে তারা তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদেরও পাপভার বহন করবে যাদেরকে তারা

১২. ইবনুল কাইয়িম, মাদারিকুছ ছালেহীন ১/২২৩ পৃঃ।
১৩. শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুসতাকীম লি মুখালাফাতি আছহাবীল জাহীম ১/২১৭-২১৮ পৃঃ।
১৪. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
১৫. বুখারী ৯৬/২০ নং অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৬/৪৬৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১৮।
১৬. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৯০০৯; ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালেহীন ১/৩২২ পৃঃ।
১৭. তবারানী, ছহীহ তারগীব হা/৫৪; সিলসিলা ছহীহা হা/১৬২০।
১৮. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।

অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্যও সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের ছওয়াবের কোন অংশকেই কমাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাউকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যা তাদের অনুসারীদের জন্য রয়েছে, অথচ এটা তাদের গোনাহর কোন অংশকেই কমাবে না'।[১৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম রীতির প্রচলন করবে তার জন্য তার কাজের ছওয়াব রয়েছে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের ছওয়াবও রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবের কিছু কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার জন্যও তার কাজের গোনাহ এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের গোনাহ রয়েছে। অথচ এটা দ্বারা তাদের গোনাহর কিছুই কম করা হবে না'।[২০]

**(১১) বিদ'আতী অভিশপ্ত :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– 'যে ব্যক্তি এর মধ্যে (ইসলামে) বিদ'আত সৃষ্টি করে কিংবা বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করেন না'।[২১]

**(১২) ইহুদী-খৃষ্টানদের স্বভাব ফুটে উঠা :** ইহুদী-খৃষ্টানরা যেমন তাদের খেয়াল খুশিমত দুনিয়াতে বিচরণের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করেছে। যার মধ্যে আল্লাহ্র প্রকৃত কালাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিদ'আতের অনুসারীরাও তেমনই নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাক্বলীদের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভালো কাজের দোহাই দিয়ে বিদ'আতের প্রচলন করে থাকে। আর এ সকল বিদ'আতের আবরণে প্রকৃত সুন্নাত ঢাকা পড়ে। তাই বিদ'আতকে শক্ত হস্তে দমন না করলে প্রকৃত ইসলাম বিদায় নিবে।

**(১৩) জাহেলী স্বভাবের পুনরাবৃত্তি :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কার কাফেরদের দেবদেবীর উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে আহ্বান করতেন, তখন তারা তাদের বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বলত, আমরা তারই অনুসরণ করব, যার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا– 'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তারই অনুসরণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭১)*।

অনুরূপভাবে বিদ'আতের অনুসারীদেরকে তাদের লালনকৃত বিদ'আতকে বর্জন করে সুন্নাতের অনুসরণের দিকে আহ্বান করলে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদারা কি কিছুই বুঝত না? পূর্বেকার আলেমেরা কি কুরআন-হাদীছ বুঝতেন না? আজ আবার নতুন নতুন হাদীছ কোথা থেকে বের হচ্ছে? এই বলে তারা তাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণীয় আমলের উপর অটল থাকে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করে।

**(১৪) সুন্নাতের অপমৃত্যু :** মুসলিম সমাজে যখন কোন বিদ'আত চালু হয় তখন সেখান থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত বিলুপ্ত হয়। আর প্রচলিত বিদ'আতই মানুষের নিকট সুন্নাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যেমন- ফরয ছালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত একটি বিদ'আত। যার মাধ্যমে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ফরয ছালাতের পরে পঠনীয় সুন্নাতী দো'আসমূহের বিলুপ্তি ঘটেছে। ফরয ছালাতের পরে রাসূল (ছাঃ) যে দো'আগুলো পাঠ করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন তা পাঠ করতে হ'লে ন্যূনতম ১০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাতের মত বিদ'আতের মাধ্যমে ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যেই মুনাজাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে তোমাদের শরী'আতকে এমন অবস্থায় পাবে- যখন মানুষ সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদ'আত সৃষ্টি করবে এবং ছালাতের সময় ছালাত আদায় না করে দেরী করে আদায় করবে। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি তাদেরকে পাই তাহ'লে আমি কী করব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র অবাধ্যদের কোন আনুগত্য নেই। এ কথা তিনি তিনবার বললেন'।[২২]

অন্য হাদীছে এসেছে, مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত বিদূরিত করেন। অতঃপর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন না'।[২৩]

**উপসংহার :** বিদ'আতী আমল সুশোভিত মনে হলেও এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। এর পরিণতিও অত্যাধিক ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

***[লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]***

১৯. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
২০. মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০।
২১. বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮।
২২. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৭৯০; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৬৪।
২৩. সুনানুদ দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮; আলবানী, সনদ ছহীহ, আত-তাওয়াস্সুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু ১/৪৬ পৃঃ।

# রামাযান ও ছিয়ামের কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**উপস্থাপনা :** রামাযান নেকী অর্জনের একটি তাক্বওয়াপূর্ণ মাস। এই মাসের ছিয়াম, ক্বিয়াম ও ক্বদরের রাত্রিতে জাগরণের মধ্যদিয়ে বিগত সকল ছগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়। এছাড়াও এ মাসে নানাবিধ আমল দিয়ে অসংখ্য নেকী অর্জন করা যায়। তবে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকতে হবে যা আমলগুলো বরবাদ করে দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে রামাযানে কতিপয় ভুল কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাল্লাহ। এ মাসের পূর্ণ ছওয়াব অর্জনের জন্যই বিষয়টি নির্বাচন। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এই ভয়ে যেন, অকল্যাণ তাকে পেয়ে না বসে'।[১]

**১. নিয়তের সাথে ছওয়াব প্রাপ্তির আশা না রাখা :** জানা আবশ্যক যে, সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[২] আর নিয়তের সাথে ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখতে হবে। নচেৎ ছওয়াব অর্জিত হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়'।[৩]

সুতরাং ছিয়াম পালনের মাধ্যমে ছওয়াব লাভের আশা না থাকলে এবং সাথে লৌকিকতা যুক্ত হলে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির শুধু না খেয়ে থাকাই হবে। কোন নেকী বা ছওয়াব হবে না। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ– 'কতক ছিয়াম পালনকারীর ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটেনা। আর কতক তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারীর কেবল রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছু জোটে না'।[৪]

আর লৌকিকতা এড়িয়ে ছিয়াম পালনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাউদ ইবনু আবী হিন্দের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি চল্লিশ বছর নফল ছিয়াম পালন করেছেন। কিন্তু তার পরিবার বা অন্য কেউ জানতে পারেনি। তিনি একজন রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বাজারে আসার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে আসতেন এবং পথিমধ্যে তা ছাদাক্বা করে দিতেন। আর সন্ধ্যায় এসে পরিবারের সাথে ইফতার করতেন। ফলে পরিবারের সদস্যরা মনে করত তিনি বাজারে খেয়েছেন এবং বাজারের লোকেরা মনে করত তিনি বাড়িতে খেয়ে থাকেন'।[৫]

**২. ফজরের পূর্বে ছিয়ামের নিয়ত না করা :** রামাযানের ফরয ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে নিয়ত করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ– 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে (ফরয ছিয়ামের) নিয়ত করবে না, তার কোন ছিয়াম নেই'।[৬]

তবে নফল ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে নিয়ত করা শর্ত নয়। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন খাবার আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, فَإِنِّيْ صَائِمٌ 'তাহ'লে আজ আমি ছিয়ামপালনকারী'।[৭]

**৩. ছোটদের ছিয়াম পালনে উৎসাহ না দেওয়া :** অনেক পিতামাতা বা অভিভাবক আছেন যাদের সন্তানদের ছিয়াম পালনে আগ্রহ থাকলেও তারা তাদের নিরুৎসাহিত করেন। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের ছিয়াম পালনে উৎসাহ দিতেন। যেমন আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে রুবাই বিনতু মুআউবিয (রাঃ) বলেন, وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ– 'আমরা আমাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকেও আল্লাহ চাহে তো ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত করে তুলতাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদত, তখন আমরা তাদেরকে সে খেলনা প্রদান করতাম। এমনি করে ইফতারের সময় হয়ে যেত'।[৮]

---

১. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।
২. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১; রাবী ওমর (রাঃ)।
৩. বুখারী হা/৩৮, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬৯০।
৫. জামালুদ্দীন জাওযী (মৃ. ৫৯২ হি.) ছিফাতুছ ছফওয়া ২/৭৮।
৬. নাসাঈ হা/২৩৩১; দারেমী হা/১৬৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৩৪।
৭. মুসলিম হা/১১৫৪; নাসাঈ হা/২৩২৭; তিরমিযী হা/৭৩৩।
৮. বুখারী হা১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।

**৪. ছিয়াম অবস্থায় দো‘আ না করা :** ছিয়ামরত অবস্থায় সারাদিন কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেই আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করতে হবে। তারপরও এমন অনেক আছেন যারা সারাদিন ব্যস্ততার কারণে দো‘আ করতে পারেন না। আবার ইফতারের পূর্ব মুহূর্তেও ইফতার তৈরীসহ নানাবিধ ছোট ছোট কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বরং দো‘আ কবুলের এই দীর্ঘ সময়ে সার্বিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র নিকটে চাইতে হবে। কেননা ছিয়ামপালনকারীর দো‘আ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দো‘আ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। (১) ছিয়াম পালনকারীর দো‘আ। (২) মযলূমের দো‘আ (৩) মুসাফিরের দো‘আ’।[৯]

**৫. মাথায় পানি না ঢালা :** কখনও দেখা যায় অধিক পিপাসার্ত বা ক্লান্তিবোধ হলেও অজ্ঞতার কারণে অনেকেই মাতায় পানি ঢালা থেকেও বিরত থাকেন। অথচ এতে কোন সমস্যা নেই। নবী করীম (ছাঃ)-এর কিছু ছাহাবী হ’তে বর্ণিত, একজন ছাহাবী বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে ‘আরজ’-এ (মক্কা-মদীনার মাঝখানে একটি জায়গার নাম) ছিয়াম অবস্থায় পিপাসা দমনের জন্য অথবা গরম কমানোর জন্য মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি’।[১০]

**৬. ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক না করা :** এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা ছিয়ামপালনকালে মিসওয়াক করেন না। অথচ মিসওয়াক করাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা ইমাম বুখারী বাব বেঁধেছেন, باب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ ‘ছায়েমের কাঁচা ও শুকনা মিসওয়াক ব্যবহার করা’। আমের বিন রাবেআ বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ) কে অসংখ্যবার ছিয়ামরত অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি’।[১১]

**৭. চূড়ান্ত অসুস্থ হলেও ছিয়াম পালন করা :**এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন, বিশেষকরে অনেক মা-বোন যারা চূড়ান্ত অসুস্থ হলেও ছিয়াম পালন করে থাকেন। আবার কেউ কষ্টকর সফরে থাকলেন ছিয়াম পালন করেন। অথচ আল্লাহ তাদেরকে পরবর্তীতে ছিয়াম পালনের সুযোগ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، ‘তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে এটি অন্য সময় গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন তার দেওয়া ছাড় গ্রহণকারীকে এবং তিনি পসন্দ করেন তার ফরয সমূহ পালন করাকে’।[১২]

**৮. ইচ্ছাকৃতভাবে তারাবীহ্‌র ছালাত ছেড়ে দেওয়া :** তারাবীহ্‌র ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বিগত দিনের (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন’।[১৩] এরপরও অনেকে তারবীহর ছালাত আদায় করে না। বরং জাহান্নাম থেকে নিজেকে মুক্তি পেতে রামাযানের দিবারাত্রিকে কাজে লাগানো উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রয়েছে (রামাযান মাসে) প্রত্যেক দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দাগণ। আর নিশ্চয়ই একজন মুসলিমের রয়েছে প্রতি দিনে ও রাতে কবুলযোগ্য দো‘আ’।[১৪]

**৯. জামা‘আতে তারাবীহর ছালাত ছেড়ে দেওয়া :** ছাহাবায়ে কেরামগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জামা‘আতে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে, قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ– আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে রামাযান মাসের ২৩তম রাতে প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীহর) ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর ২৫তম রাতে তার সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত (তারাবীহর) ছালাত আদায় করলাম। আবার তার সাথে ২৭তম রাতে (তারাবীহর) ছালাত আদায় করতে লাগলাম। এমনকি আমরা আশংকা করলাম যে, ‘ফালাহ’ বা সাহারী পাব না’।[১৫]

সুতরাং রামাযান মাসে প্রথম রাত্রির তারাবীহ্‌র ছালাত ইমামের সাথে জামা‘আতে আদায় করা যরূরী। কেননা যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করবে সে সারারাত্রি ছালাত আদায়ের ছওয়াব লাভ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ– ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইমানের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরে যায়, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ রাত্রির ছালাত আদায়ে ছওয়াব দেন’।[১৬]

**১০. ছালাতে উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করা :** রামাযান মাসে অনলাইনে এমন অনেক ক্বারীর তেলাওয়াত শোনা যায়, যারা উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করেন। এটা বাড়াবাড়ী। অথচ ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর কান্না সম্পর্কে হাদীছে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর হ’তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ– ‘একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

৯. ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩০; মাজমাউয যাওয়ায়দ হা/১৭২২৮।
১০. আবুদাউদ হা/২৩৬৫; আহমাদ হা/১৫৯৪৪; মিশকাত হা/২০১১।
১১. বুখারী ৭/২৩৪ পৃ.।
১২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫৪; ছহীহ হা/১০৬০।
১৩. বুখারী হা/৩৭; মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।
১৪. আহমাদ হা/৭৪৪৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৭৬৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১০০২।
১৫. নাসাঈ হা/১৬০৬; ছহীহ ইবনু খুযাইমা হা/২২০৪।
১৬. আবু দাউদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮।

কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম তিনি ছালাত আদায় করছেন। এমতাবস্থায় তাঁর বক্ষদেশ হ'তে কান্নার এমন শব্দ বের হচ্ছে, যেমন চুলার উপর রাখা পাত্র হ'তে টগবগ শব্দ শোনা যায়'।[১৭]

**১১. ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে ছালাত আদায় করা :** ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে ছালাত আদায় করা নিষেধ। বরং ঘুম আসলে ঘুমিয়ে যেতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ; فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ– 'ছালাতরত অবস্থায় তোমাদের কারো ঘুম আসলে, সে যেন প্রথমে ঘুমিয়ে নেয়। তাতে তার ঘুমের আবেশ কেটে যাবে। কেননা সে যদি তন্দ্রাবস্থায় ছালাত আদায় করে, তবে এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, সে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিবে'।[১৮]

**১২. দীর্ঘ ক্বিরাআত না করে অধিক রাকা'আত পড়া :** খতম তারাবীহ্র নামে অনেক সমাজে ১১ রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করে। যেখানে রুকূ, সিজদা, ক্বিরাআত কোন কিছুই পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না। অথচ ছাহাবীদের আমল ভিন্ন ছিল। যেমন সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ্ দারীকে আদেশ দিলেন যেন তারা লোকেদেরকে নিয়ে রামাযান মাসের রাতের এগার রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করে'। অতঃপর তিনি (রাবী) বলেন, كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ 'এ সময় ইমাম তারাবীহ্র ছালাতে এ সূরাগুলো পড়তেন, যে সূরার প্রত্যেকটিতে ১০০-এর বেশী আয়াত ছিল। বস্তুত ক্বিয়াম বেশী লম্বা হওয়ার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে (ফজরের) নিকটবর্তী সময়ে ছালাত শেষ করতাম'।[১৯]

**১৩. চার রাকা'আত তারাবীহ পড়ার পর না বসা :** রাসূল (ছাঃ) ৪ রাকা'আত ছালাত আদায় করার পর তিনি অল্প কিছু সময়ের জন্য বসতেন। এ বিষয়ে মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ– তিনি চার রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন, তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাকা'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না'।[২০]

**১৪. ইচ্ছাকৃত বিতর ছালাত ছেড়ে দেওয়া :** কিছু ব্যক্তি আছেন যারা বিতর ছালাতকে গুরুত্ব দেন না। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর ছালাত ছেড়ে দেন। তাদের সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর ছালাতক ছেড়ে দেয়, তাহ'লে সে মন্দ ব্যক্তি। আর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না'।[২১]

**১৫. হায়েয বা নিফাস অবস্থায় ছিয়াম পালন :** এমন অনেক মহিলা আছেন যারা চোখ লজ্জার কারণে হায়েয বা নিফাস অবস্থায় ছিয়াম পালন করেন। অপবিত্র কিছু খাওয়া যাবেনা মনে করে সারাদিন না খেয়ে থাকেন। অথচ এটি ভুল সিদ্ধান্ত । কেননা মুআযাহ নামক এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার যে, ঋতুমতী মহিলা ছিয়াম কাযা করবে অথচ ছালাত কাযা করবে না? মা আয়েশা (রাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, তুমি কি (ইরাকের) হারুরার (খারেজীপন্থী) মহিলা? মহিলাটি বলল, না, আমি তা নই। আমি জিজ্ঞাসা করে (কারণ) জানতে চাই। মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র আসূল (ছাঃ)-এর কাছে থেকে আমাদের মাসিক হত। আমরা (তাঁর পক্ষ থেকে) ছিয়াম কাযা করতে আদিষ্ট হতাম এবং ছালাত কাযা করতে আদিষ্ট হতাম না'।[২২]

**১৬. সময়ের পূর্বেই ইচ্ছাকৃত ছিয়াম ভঙ্গ করা :** বিনা ওযরে সূর্যাস্তের পূর্বেই ছিয়াম ভঙ্গ করা একটি মারাত্মক ধরণের অপরাধ। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তারা আমার উভয় বাহুর উপরাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন। আমি বললাম, এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম। তারা বললেন, আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব। সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের? তারা বললেন, এ হ'ল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি। পুনরায় তারা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কেশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম, ওরা কারা? তারা বললেন, ওরা হ'ল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করে নিত'।[২৩]

**১৭. সাহারী ছেড়ে দেওয়া :** অনেক সময় মায়েদের রান্না যথা সময়ে না হলে অনেক পরিবার কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। বরং তাদের সামান্য খেজুর বা পানি হলেও খেতে হবে। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)

১৭. আবু দাউদ হা/৯০৪; নাসাঈ ১২১৪; মিশকাত হা/১০০০।
১৮. বুখারী হা/২১২; মুসলিম হা/৭৮৬; মিশকাত হা/১২৪৫।
১৯. আবু দাউদ হা/১৩২৫; মালেক হা/২৫৩; মিশকাত হা/১৩০২।
২০. বুখারী হা/৩৫৬৯; মুসলিম হা/৭৬৮।
২১. ইবনু কুদাম, মুগণী ২/১৬১পৃ.।
২২. মুসলিম হা/৩৩৫; আবুদাঊদ হা/২৬৩; মিশকাত হা/২০৩২।
২৩. হাদীছ সম্ভার ১০৬৬।

বলেছেন, السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ– সাহারী হ'ল একটি বরকতময় খাবার। তাই তোমরা ছেড়ে দিয়ো না। এক ঢোক পানি দ্বারা হলেও সাহারী করো। কেননা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ সাহারীতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দো'আ করেন'।[২৪]

**১৮. দেরীতে ইফতার করা :** আধুনিক যুগে সূর্য ডোবার নির্দিষ্ট সময় জানার পর আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ৩ মিনিট অপেক্ষা কোন নিরন্তর বোকামী। কেননা বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা প্রতিটি এলাকায় কোথায় কত মিনিট সূর্য অস্তমিত হচ্ছে এটা জানা খুবই সহজ। আর সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশও বটে। তিনি বলেন, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ– 'যখন রাত্রি (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন অবশ্যই ছিয়ামপালনকারী ইফতার করবে'।[২৫]

রাসূল আর দ্রুত ইফতার করা কল্যাণের উপর টিকে থাকার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'যতদিন পর্যন্ত মানুষ শীঘ্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে'।[২৬] আর দ্রুত ইফতার করা নবীদের স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য। যেমন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ– 'তিনটি বিষয় নবী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। (১) ইফতারে দ্রুত করা। (২) শেষ সময়ে সাহারী খাওয়া। (৩) ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা'।[২৭]

**১৯. রাত্রে খেল-তামাশায় কাটানো ও দিনে ঘুমানো :** এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা রামাযান মাসে রাত্রে অযথা বিভিন্ন মাধ্যমে সময় কাটান। আর দিনের বেলায় ঘুমান। যা শারঈ বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহান আল্লাহ দিনকে জীবিকা অর্জনের জন্য এবং রাত্রিতে ঘুমের মাধ্যমে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তৈরী করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا– وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا– 'আমরা রাত্রিকে করেছি আবরণ। এবং দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল *(নাবা ৭৮/১০-১১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ– 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার' *(ইউনুস ১০/৬৭)*।

**২০. সাহারী খাওয়ার পর ফজর না পড়ে ঘুমানো :** এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সাহারী খাওয়ার পরপরই ফজর ছালাত না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অথচ সাহারীর সময়টি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সময় আল্লাহ শেষ আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দার ফরিয়াদ কবুল করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ– 'প্রতি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মর্যাদাবান বারাকাতপূর্ণ রব দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 'কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। যে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দান করব। যে আমার নিকট মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দেব'।[২৮] সুতরাং সাহারীর পূর্ব বা পরবর্তী এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গল্প-গুজব, ফেসবুক, ইউটিউব না চালিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

**উপসংহার :** ছিয়াম থেকে ছওয়াব লাভে ব্যর্থ ব্যক্তি যথার্থই ব্যর্থ। সুতরাং ছওয়াব অর্জনের এই মহা সুযোগটা যেন প্রকৃতই আমাদের জন্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির উপায় হয়, সেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।-আমীন!

**[কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]**

২৪. আহমাদ হা/১১৪১৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৮৩।
২৫. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫।
২৬. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
২৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২৬১১; ছহীহুল জামে' হা/৩০৩৮।
২৮. বুখারী হা/৬৩২১; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

**At-Tahreek TV**

**অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য**

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

**Youtube লিংক :**
www.youtube.com/attahreektv

**Facebook লিংক :**
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

# ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন

-আশরাফুল ইসলাম

**(শেষ কিস্তি)**

**দলীল-৪ :** ছাহাবী আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, هَلْ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوْعِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوْا وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 'আমি কি তোমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত দেখাব না? অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং দু'হাত উত্তোলন করলেন, আবার তাকবীর দিলেন ও রুকূর জন্য দু'হাত উত্তোলন করলেন। রুকূ হ'তে উঠার সময় বললেন সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ এবং দু'হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা এভাবেই ছালাত আদায় করবে। তিনি সিজদার সময় দু'হাত উত্তোলন করেননি'।[১]

**তাহক্বীক্ব :** মুহাম্মাদ ইবনে মুবারাক হাকিমী বলেন, এই হাদীছের সনদের সকল রাবী ছিক্বাহ'।[২] শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ এই হাদীছের সনদ ছহীহ বলেছেন'।[৩]

**লক্ষণীয় :** ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাবেঈদেরকে ছালাত শিক্ষা দেওয়ার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত শিক্ষা দিলেন। যদি রাফ'উল ইয়াদায়েন করা মানসূখ হ'ত তাহ'লে তিনি বলতেন না, তোমরা এভাবেই ছালাত আদায় করবে। বরং তিনি বলতেন, তোমরা রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে না। কারণ প্রথম দিকে রাসূল (ছাঃ) করলেও পরে তা আর করেননি।

**দলীল-৫ :** মুহাম্মাদ ইবনু আমর (রহঃ) বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস-সা'এদী (রাঃ)-কে দশজন ছাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চেয়ে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, কীভাবে? আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো তাঁর অনুসরণ ও সাহচর্যের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে বেশী অগ্রগামী নন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁরা বললেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বললেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়ানোর সময় নিজের দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এরপর ক্বিরাআত করে তাকবীর দিয়ে রুকূতে গমনকালে স্বীয় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর রুকূতে গিয়ে দু'হাতের তালু দ্বারা হাঁটুদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতেন। রুকূতে তাঁর মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল থাকত। এরপর রুকূ হ'তে মাথা উঠিয়ে 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলে স্বীয় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন...। তখন তাঁরা সকলে (উপস্থিত ছাহাবীগণ) বললেন, صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই ছালাত আদায় করতেন'।[৪]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন'।[৫] ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন'।[৬] ইমাম নববী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন'।[৭] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ছহীহ বলেছেন'।[৮] এছাড়াও শায়েখ শুআ'ইব আরনাউত্ব (রহঃ), শায়েখ আলবানী (রহঃ) তাহক্বীক আবু দাউদে এই হাদীছের সনদ ছহীহ বলেছেন।

লক্ষণীয় যে, ঐ দশ জন ছাহাবীর মধ্যে ছিলেন, আবু উসাইদ, সাহল ইবনু সা'দ, আবু হুরায়রা, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ)।[৯] ভাবুন তো একবার! ১০ জন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে বলেছেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই ছালাত আদায় করতেন। এর পরেও আমরা বলব? রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন!

এই হাদীছের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেছেন, مَنْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيْثَ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ– يَعْنِي إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ 'এই হাদীছ শোনার পরেও যে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করেনি তার ছালাত অসম্পূর্ণ'।[১০] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। তিনি কখনই তা ছেড়ে দেননি।

১. দারাকুৎনী হা/১১২৪ 'ছালাত' অধ্যায়-৩।
২. ফাতাওয়া নাবিইঈ আছহাবিল জামে' ২/২৫০ পৃ.।
৩. নুরুল আইনাইন ১১৮ পৃ.।
৪. আবুদাউদ হা/৭৩০ 'ছালাত শুরু করার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।
৫. তিরমিযী হা/৩০৪ 'রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ।
৬. মা'আলিমুস সুনান ১/১৯৪ পৃ.।
৭. খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৫৩।
৮. তাহযীব ফি সুনানি আবুদাউদ ২/৪১৬ পৃ.।
৯. জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৮৯।
১০. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৮৯।



www.tawheederdak.com

**দলীল-৬** 'আছেম আল-আহওয়াল (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ– 'আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। আর তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন'।[১১]

**লক্ষণীয় :** রাসূল (ছাঃ) মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত দশ বছর আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) তাঁর খেদমত করেছেন'।[১২] রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের শেষদিনগুলোতেও যখন আবুবকর (রাঃ)-কে ছালাতে ইমামতি করার আদেশ করেছিলেন, তখনও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ছিলেন। সেই দিনটি ছিল সোমবার এবং রাসূল (ছাঃ) ঐ দিনই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন'।[১৩] এমনকি আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে কবর দেওয়ার সময়ও ছিলেন'।[১৪] এর চেয়ে বড় দলীল আর কি হ'তে পারে? রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, অথচ কবরে রাখা পর্যন্ত যে ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন তিনি জানবেন না? আর তিনি জানার পরেও রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করবেন?

**দলীল-৭ :** আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ– 'আমি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূ করতেন, রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূতে যেতেন এবং রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন'।[১৫]

**তাহক্বীক :** এই হাদীছের সকল রাবীকে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) ছিক্বাহ বলেছেন'।[১৬] এছাড়াও ইমাম যাহাবী[১৭] ও ইমাম ইবনু হাজার আস-ক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছের সকল রাবীকে ছিক্বাহ বলেছেন'।[১৮] এই হাদীছটিকে শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ[১৯] শায়খ শো'আইব আরনাঊত[২০] শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী[২১] ছহীহ বলেছেন।

**লক্ষ্যণীয় :** আবুবকর (রাঃ) সেই ছাহাবী, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে কাছের মানুষ। যিনি রাসূল (ছাঃ) কতৃক নির্ধারিত ইমাম। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবিত থাকাবস্থায় তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর স্থলে ছাহাবীদের নিয়ে ইমামতি করেছেন'।[২২] আর তিনিও জানবেন না রাসূল (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন ছেড়ে দেওয়ার কথা?

**দলীল-৮ :** আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসেম (রহঃ) বলেন, 'একদা মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের মাঝে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এসে বললেন, তোমরা আমার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত আদায় করব। অর্থাৎ পড়িয়ে দেখাব। রাসূল (ছাঃ) যেভাবে পড়তেন আবার আমাদের যেভাবে পড়ার জন্য হুকুম দিতেন। তারপর ওমর (রাঃ) ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার। তারপর তার দৃষ্টিনত করলেন। এরপর তিনি দু'হাত উত্তোলন করলেন কাঁধ বরাবর, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গেলেন। তিনি আবার দু'হাত উত্তোলন করলেন যখন রুকূ হ'তে দাঁড়ালেন। এভাবে ছালাত আদায়ের পর তিনি মানুষদের বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই আমাদের ছালাত পড়াতেন' (هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي بِنَا)।[২৩]

**তাহক্বীক :** সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাকারী ইমাম ফাতহুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (মৃ. ৭৩৪ হি.) বলেছেন, এই হাদীছের সকল রাবী ছিক্বাহ'।[২৪] ইমাম আবুল ফায়েয আহমাদ ইবনু ছিদ্দীক আল-গুমারী (মৃ. ১৩৮০ হি.) এই হাদীছের সকল রাবীকে ছিক্বাহ বলেছেন'।[২৫] ইমাম হাকেম (রহঃ) এই হাদীছকে ছহীহ বলেছেন'।[২৬] এছাড়াও যুবাইর আলী যাঈ (রহঃ) ছহীহ বলেছেন'।[২৭]

**দলীল-৯ :** আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ

১১. জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৯।
১২. তিরমিযী হা/৩৮৩৩, জুবায়ের আলী জাঈ (রহঃ) ছহীহ বলেছেন।
১৩. বুখারী হা/৬৮০ 'আযান' অধ্যায়-১০; 'বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামাতের অধিক যোগ্য' অনুচ্ছেদ-৪৬।
১৪. বুখারী হা/৪৪৬২ 'মাগাযী' অধ্যায়-৬৪; 'নবী করীম (ছাঃ)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত' অনুচ্ছেদ-৮৩।
১৫. বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/২৬২০ 'ছালাত' অধ্যায়-৩ 'রুকূতে যাওয়ার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা' অনুচ্ছেদ-১৭৮।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. আল-মুহাযযাব ২/৪৯ পৃ.।
১৮. আত-তালখীছুল হাবীর, ১/২১৯ পৃ.।
১৯. নূরুল আইনাইন ৪২৫ পৃ.।
২০. আহমাদ, তাহক্বীক্ব শু'আইব আরনাঊত হা'২৩০৮-এর টিকা দ্রষ্টব্য।
২১. আবকারুল মিনান ৭২৭ পৃ.।
২২. বুখারী হা/৬৮০ 'আযান' অধ্যায়-১০; 'বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামাতের অধিক যোগ্য' অনুচ্ছেদ-৪৬।
২৩. বায়হাক্বী, আল-খিলাফিয়াত হা/১৬৬৮।
২৪. আন-নাফহুশ শাযী ফি শারহ সুনানুত তিরমিযী ৪/৩৯১ পৃ.।
২৫. আল-হিদায়া ফি তাখরিজি আহাদিছিল বিদায়া ৩/১০৯ পৃ.।
২৬. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫০১ পৃ.।
২৭. নূরুল আইনাইন ১৬৩-১৬৪ পৃ.।

وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয ছালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে তাঁর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি ক্বিরাআত শেষে রুকূতে গমনকালে এবং রুকূ হ'তে উঠার সময়ও অনুরূপ করতেন। তবে বসে ছালাত আদায়কালে তিনি এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি দুই সিজদার পর (অর্থাৎ দুই রাকা'আত পর)[২৮] দাঁড়ালে দু'হাত অনুরূপ উঠিয়ে তাকবীর বলতেন'।[২৯]

**হাদীছটির তাহক্বীক :** আহমাদ ইবনু হাম্বল হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন'।[৩০] ইমাম তিরমিযী হাসান ছহীহ বলেছেন'।[৩১] শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ হাসান বলেছেন'।[৩২] ড. মুস্তফা আল-আজমী হাসান বলেছেন'।[৩৩] আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ছহীহ বলেছেন'।[৩৪]

**লক্ষ্য করুন :** আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) শুধু রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীই ছিলেন না, বরং আপন চাচাত ভাই ও জামাতা। এবিষয়টি কারো অজানা নয়। এমনকি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তিনিই।[৩৫] রাসূল (ছাঃ) জীবনের শেষ সময়ের অসুস্থতায় যার কাধে ভর দিয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়েছিলেন।[৩৬] ভাবুন তো সেই আলী (রাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন, রাসূল (ছাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন ছাড়লেন কখন?

**দলীল-১০ :** আবু যুবায়ের হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ– 'জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন তার উভয় হাত উঠাতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে তার মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি'।[৩৭]

**তাহক্বীক্ব :** সুনান ইবনু মাজাহ্‌র বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার মুহাম্মাদ আল-আমীন আল-হারারী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন'।[৩৮] শো'আইব আরনাঊত্ব (রহঃ) তাহক্বীক্ব ইবনে মাজাহতে হাসান বলেছেন'।[৩৯] হানাফী ফক্বীহ শায়খ নূরুদ্দীন সিন্ধী (রহঃ) এই হাদীছের সকল রাবীকে ছিক্বাহ বলেছেন'।[৪০]

২৮. বদরুদ্দীন আইনী হানাফী বলেন, দুই রাক্ব'আত পর যখন উঠতেন, তখন হাত উঠাতেন। সুনানু আবুদাউদ লিল আইনী ৩/৩৬৭ পৃ.।
২৯. আবুদাউদ হা/৭৪৪; তিরমিযী হা/৩৪২৩।
৩০. ইমাম জাইলাঈ হানাফী (রহঃ), নাসবুর রাইয়া ১/৪১২ পৃ.।
৩১. তিরমিযী হা/৩৪২৩ 'রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত দো'আ' অধ্যায়।
৩২. তাহক্বীক্ব আবুদাউদ লিল আরনাঊত্ব, হা/৭৪৪।
৩৩. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, তাহক্বীক্ব লিল আজমী, হা/৫৮৪।
৩৪. তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ লিশ শাকির হা/৭১৭।
৩৫. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৭/২৩৯ পৃ.।
৩৬. বুখারী হা/১৯৮।
৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৮৬৮।
৩৮. শারহু ইবনু মাজাহ লিল হারারী, ৫/৫১৮ পৃ.।
৩৯. তাহক্বীক্ব সুনানু ইবনু মাজাহ লিল আরনাঊত্ব হা/৮৬৮।
৪০. হাশিয়াতুস সিন্ধি লিস সুনানি ইবনু মাজাহ ১/২৮৪।

**লক্ষ্যণীয় :** জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তিনদিন পূর্বেও তার পাশে ছিলেন'।[৪১] তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন বাদ দিলেন কবে? কখন তা মানসূখ হ'ল? বরং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ছাহাবী জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময়ে এবং রুকূ হ'তে উঠার সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।

**দলীল-১১ :** আবু হামযাহ (রহঃ) বলেন, رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ– 'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, রুকূ করতেন ও রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন'।[৪২]

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পাশেই ছিলেন।[৪৩] তাহ'লে এটা স্পষ্ট যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে দেখেন, যদি না দেখতেন তাহ'লে তাঁর মৃত্যুর পরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময় রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না।

**দলীল-১২ :** আব্দুর রহমান ইবনুল আ'রায আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ– 'নিশ্চয়ই আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন তাকবীর দিতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন'।[৪৪]

**লক্ষ্যণীয় :** আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজেই বলতেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে সবার থেকে ভাল জানেন'।[৪৫] একদা তিনি ছালাত শেষ করে বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا– 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্য হ'তে আমার ছালাত আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া হ'তে বিদায় নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর ছালাত এ রকমই ছিল'।[৪৬]

সুতরাং সুধী পাঠকের নিকট এটি নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যে, রাসূল (ছাঃ) কোনদিনই রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছাড়েননি। আর তা মানসূখও হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।-আমীন!

*[দক্ষিণ শালিকা, মেহেরপুর]*

৪১. মুসলিম হা/২৮৭৭।
৪২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, মুহাক্বিক্ব আবু আওয়ামাহ হা/২৪৪৬; মুছান্নাফ জামিউ' লিলফাতওয়া ৫/৮১ পৃ;।
৪৩. বুখারী হা/৪৪৩২, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, ৪৪৫৪।
৪৪. জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৮।
৪৫. আল মুখাল্লাছিয়াত হা/১২২৯ সনদ হাসান।
৪৬. বুখারী হা/৮০৩।



www.tawheederdak.com

# সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

-অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী

[শেষ কিস্তি]

**ভারতীয় কংগ্রেস ও সৈয়দ আহমদ খান**

সিপাহী জিহাদের পর থেকে বৃটিশ এদেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, তাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার শুরু করে। বৃটিশের এই পলিসি Divide and Rule নামে পরিচিত। তবে হিন্দু-মুসলমানকে বৃটিশ শক্তি পৃথক করেনি। পার্থক্য তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস থেকেই তা সুস্পষ্ট। বৃটিশ প্রথমে হিন্দুসমাজকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে থাকে এবং তাদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে দমিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে চায়। এই বৃটিশ নীতি বহু সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গোপনীয় চিঠিপত্রাদি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। প্রসঙ্গতঃ সিপাহী জিহাদের অব্যবহিতকাল পর লেখা মুরাদাবাদের বৃটিশ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জন কোকের চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বের গভর্ণর লর্ড এলফিনস্টোন এর সমর্থনে ১৮৫৯ সালের ১৪ই তারিখে লিখেন যে, Divide et Impera was the old Roman Motto and it Should be ours.

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উফরিন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি এই নীতিকে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করবার জন্য কাজে লেগে যান। তিনি Allon Octovian Hume নামক এক বৃটিশ সিভিলিয়ানকে এই সাধুকার্যে নিয়োযিত করলেন। ভারতীয় সরকারের সঙ্গে হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্যে হিউমের পৃষ্ঠপোষকতায় "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন হলো, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বেতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। বৃটিশ শাসন যে ভারতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ তা পূনঃ পূনঃ ঘোষণা করে কংগ্রেস বৃটিশের নিকট থেকে হিন্দু সমাজের জন্য অধিকতর রাজনীতিক অধিকার পাবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি তাঁর ভাষণে বলেন- Much has been done by Great Britain for the benefit of India, and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order, she had given them railways and above all she had given them the inestimable blessing of western eduction.

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরোজী বলেন-'It is under the civilizing rule of Queen and people of England that we meet here together, hindered by none, and are freely allowed to speak our minds without the least fear and without the least hasitation such a thing is possible under British rule and British rule only. এভাবে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর দৃঢ়কৃত করবার সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলো।

কংগ্রেস সুচতুরভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজের স্বার্থ ও দাবী দাওয়া আদায় করতে শুরু করলো। কংগ্রেস ভারতের জন্য প্রতিনিধিমূলক সরকারের সম্প্রসারণ এবং সরকারী চাকরীতে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মারফৎ ব্যাপক ভারতীয় লোকের নিযুক্তি দাবী করলো। একটুখানি চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কংগ্রেস মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কায়েম হবে, তাহবে আসলে হিন্দুরাজ। অন্যদিকে সরকারী চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মারফৎ যে নিযুক্তি হবে তাতে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা মুসলমানরা তখনো ইংরেজী শিক্ষার ক খ পর্যন্ত শিখে উঠেনি।

সৈয়দ আহমদ খান প্রবলভাবে কংগ্রেস নীতির বিরোধিতা করলেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে নিষেধ করলেন। হিন্দু কংগ্রেস বোম্বের মুসলিম নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং রহমাতুল্লাহ এম, সায়ানীকে সম্মুখে রেখে মুসলিম সমাজকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র প্রভাব ছিলোনা। অপরপক্ষে ভারতীয় মুসলিম সমাজে সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাব ছিলো অপরিসীম। তিনি কংগ্রেসের বিরোধীতার জন্য 'মুশ্তারেকা জামাতে মুহিব্বানে হিন্দ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোললেন এছাড়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন কলকাতায় চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করেন, তখন তিনি একই শহরে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম সমাজের দৃষ্টিকে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ফিরিয়ে আনা। সৈয়দ আহমদ এতে সাফল্য অর্জন করেন। পাক-ভারতের বহুস্থানে 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় এবং স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজকে শিক্ষা এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার জন্যে আহ্বান জানাতে থাকেন। সৈয়দ আহমদের ব্যাপক চেষ্টার ফলে মুসলিম জাতির মধ্যে রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ পুরোপুরিভাবে রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা স্পষ্টই দ্বিজাতিতত্ত্বের উপলব্ধির পরিচয় পাচ্ছি। তমদ্দুনিক, শিক্ষাগত এবং রাজনীতিক যেকোনো দিক থেকে দেখিনে কেন মুসলিম পুণর্গঠন অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম নায়ক হিসেবে সৈয়দ আহমদের অবদান পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতির হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকবে। অপর কথায় সৈয়দ আহমদকে পাকিস্তানের অন্যতম জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ মৃত্যুবরণ বরণ করেন।

### ইসলামী রেনেসাঁ ও আমীর আলী

মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে 'স্পিরিট অব ইসলাম' এবং হিস্ট্রি অব দি সেরাসিন্স এর লেখক জাষ্টিস আমীর আলীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ আহমদ ছিলেন মূলতঃ কর্মবীর। তাই শিক্ষা সংগঠনের মারফৎ তিনি জাতির জন্যে জাগরণের সাড়া যুগিয়েছেন। আমীর আলী ছিলেন মূলত চিন্তাবীর, তাই মৌলিকগ্রন্থ প্রকাশনার মারফৎ তিনি জাতির চিন্তাজগতে বিপ্লব সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমীর আলী Spirit of Islam প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের মারফৎ তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (ছ.) চারিত্রিক মাধুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় খণ্ডের মারফৎ বিশ্ব নবীর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুমহান আদর্শের পরিচয় প্রাচ্যের শিথিল বিশ্বাস মুসলিম সমাজ এবং প্রতীচ্যের ইসলাম অনভিজ্ঞ খৃষ্টীয় সমাজের নিকট অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে উপস্থিত করেন। স্পিরিট অব ইসলাম পাক-ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম সমাজের যে ব্যাপক আদর্শ-সচেতনতা জন্ম দেয় তার সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়াতেই পরবর্তী স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই 'স্পিরিট অব ইসলাম'কে পাকিস্তান আন্দোলনের একটি সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর বল্‌লে কিছুমাত্র অত্যন্তি করা হয়না। ইসলামের সর্বজনীন ধর্মীয় মতবাদ, ইসলামের মহান যুদ্ধনীতি, পরমত সহিষ্ণুতা দাস প্রথার বিলোপ, সাধন-প্রচেষ্টা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক গণশিক্ষার সম্প্রসারণ নীতি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রয়োগ এবং সর্বোপরি ইসলামী গণতন্ত্রের সার্বিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক ও সামগ্রিক আলোচনা দ্বারা আমীর আলী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম প্রগতির ধর্ম, শান্তির ধর্ম ও মানবতার ধর্ম।

'স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে আমীর আলী ইসলামের মতবাদগত দিকটি আলোচনা করেছেন আর History Of The Saracens গ্রন্থের মারফৎ তিনি শিখিয়েছেন যে, ইসলাম গ্রহণকারী আরবজাতি কিভাবে বিশ্বের প্রগতি, শিক্ষা ও তমুদ্দুনকে সমুন্নত করবার জন্যে সাধনা করে গিয়েছেন।

আমীর আলী মুসলিম জাতির অতীত গৌরবকে এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান করেছেন। সমৃদ্ধ অতীতের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতি নতুন বর্ত্তমানকে গড়ে তোলবার প্রেরণা যে বহুলাংশে আমীর আলীর নিকট লাভ করেছে, মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে সেকথা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। আমীর আলী যে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ ও তমদ্দুনের পুঁথিগত অনুশীলন করে গিয়েছেন তাই নয়। জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি জাতির বৃহত্তর রাজনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রাজনীতি ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন। যে আমীর আলী কংগ্রেসের দ্বিতী কোলকাতা অধিবেশনে যোগদান করে জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত হন। সেই আমীর আলীরই নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব লর্ড মর্লিকে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য করেন। সৈয়দ আহমদ এবং আমীর আলী উভয়েই প্রধানতঃ শিক্ষা এবং তমদ্দুনের অনুশীলন করতে চেয়েছেন। কিন্তু মুসলিম জাতি রাজনীতির অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া যে ইসলামী শিক্ষা এবং তমদ্দুনের বিকাশসম্ভব নয় এই বোধের ফলে উভয়েই রাজনীতি আন্দোলনের পর্যায়ে নেমে এসেছেন।

### ইসলামী রেনেসাঁ ও ইকবাল

শুধু সৈয়দ আহমদ বা আমীর আলী নন, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মহাদার্শনিক কবি ইকবালের সম্পর্কে ও একই কথা খাটে। ইকবাল ছিলেন প্রধানতঃ কবি এবং দার্শনিক। কিন্তু পাক ভারতীয় মুসলিম জাতির রাজনীতিক সংস্থা সংগঠনের কার্যেও তাকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এ কথাটাই সুইস্পষ্ট যে, রেনেসাঁর মারফৎ মুসলিম চিন্তা পূর্ণ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম রাজনীতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মুসলিম জাতি অধিকত সচেতন হ'তে থাকে। আলোচ্য মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমিতে ইকবালের অবদান যে কত সুদূপ্রসারী, তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান প্রবন্ধে যে আলোচনার সুযোগও সীমাবদ্ধ। এক কথায় বলা যায়, ইকবালের কাব্য পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতির রেনেসাঁ আন্দোলনের সর্বশেষ তরঙ্গ। তাই ব্যাপকতার দিক থেকে তার সর্ব্বোপ্লাবী সয়লাব মুসলিম জাতির নবজীবন লাভের গভীরতম প্রেরণাস্থল হ'তে পেরেছে। ইকবালের ধর্মীয় চিন্তার পুর্ণগঠন বক্তৃতামালাতে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারায় চূড়ান্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

### রেনেসাঁর আলোকে রাজনীতিক সংগঠন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে রেনেসাঁর নবালোকে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতি তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের সাথে বাঁচাবার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। রেনেসাঁ আন্দোলন জাতির তমদ্দুনিক স্বাতন্ত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম জাতি নিজেদের রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তুলবার অনুপ্রেরণা লাভ করে। অপরপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দু স্বার্থকেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পাক ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণ দিনের পর দিন অধিকতর ওয়াকিফহাল হ'তে থাকে। ঠিক এই সময়টাতেই হিন্দু কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয়তার স্বরূপটি মুসলিম জনগণের নিকট স্পষ্টভাবে উদঘাটিত হয়ে পড়ে।

পূর্বোল্লিখিত হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনসমূহের প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই সুস্পষ্ট হিন্দু রাজনীতিক সংগঠনের পরিবেশ রচনা করেছিলো। কেননা দু'একটি আন্দোলন ছাড়া অধিকাংশ হিন্দু আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিলো। আর হিন্দুরা গণশক্তিকে (Mass) আকৃষ্ট করেছিলো। হিন্দুসমাজ কংগ্রেসকে পরিপূর্ণভাবে হিন্দু সংগঠনরূপে গড়ে তোলাবার পক্ষপাতী ছিলো। হিন্দুসমাজের এই মনোভাবকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে এগিয়ে এলেন বালগঙ্গাধর তিলক নামক একজন মারাঠী। ইনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থী দল তৈরী করলেন। হিন্দু জনগণের মধ্যে চরম মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টিকরা এবং গোহত্যা বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করাই ছিল তিলক এবং তাঁর অনুসারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু জনগণের মধ্যে তিলকেরই একচ্ছত্র নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। পণ্ডিত নেহরু বলেন, The real symbol of the new age was Bal Gangadhar Tilak from Maharashtra. The old leadership was represneted also by a Maratha, a very able and younger man, Gopal krishna Gokhle. কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাতে তিলকপন্থীদের হাতে চলে না যায়, সে জন্য বৃদ্ধ মধ্যমপন্থী দাদাভাই নেরোজিকে পূর্ণবার কংগ্রেস নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পন্ডিত নেহেরুর মধ্যপন্থীদের এই বিজয় সম্বন্ধে বলেন- But this had been won because of organisational control and the narrow franchise of the congress, There was no doubt that the vast majority of politically minded people in India favoured Tilak and his group the discovery of India.

সুতরাং একথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, কংগ্রেস কেন আর মুসলিম জনগণকে মিলনের সুমধুর স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে ২৫৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে মুসলমান প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিলো মাত্র ১৭ জন। মুসলিম সমাজের রাজনীতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবার অনুকূল পরিবেশ ঠিক এই সময়েই গড়ে উঠেছিলো। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী করে তোলে। বাংলার মুসলমানরা চাকরী-বাকরী ব্যবসার-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হাসেল ইত্যাদি সকল বিষয়ে হিন্দুদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আসছিলেন। কোলকাতার হিন্দু নেতৃত্বের নাগপাশ থেকে নাজাত পাবার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা বাংলা ও আসামকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করবার দাবী তুলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার্থে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। ঢাকাতে এর রাজধানী স্থাপিত হয়। কোলকাতার বন্ধন মুক্ত হয়ে মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে নফল শোকরিয়া নামায আদায় করেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের এ ব্যবস্থা মনঃপুত হলোনা। তারা বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার আন্দোলন শুরু করলেন। তিলক এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন। দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে মুসলমানরা উপলব্ধি করল যে, মুসলমান জাতির স্বার্থ রক্ষা করা কংগ্রেসের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের তাকিদে মুসলিম রাজনীতিক দলের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হলো।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে উদারনীতিক দল ক্ষমতাসীন হলো। সরকার ঘোষণা করলো যে, ভারতের শাসন বিধিতে প্রয়োজনের সংস্কার সাধন করা হবে। তখন মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করলেন যে, প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের সম্প্রসারণ নীতি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা এও উপলব্ধি করলেন যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংস্কার আন্দোলন এবং তিলকপন্থীদের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের ফলে এ দেশে এমন এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলিম স্বার্থের রক্ষণাকারী মুসলমান প্রার্থীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটে নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। এজন্যই মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবী করলেন। এই দাবী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পেশ করবার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। লর্ড মিন্টো পৃথক-নির্বাচন দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং পরবর্তী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা কবুল করা হয়।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সরকারী স্বীকৃতি আদায় করা মুসলিম-রাজনীতি ক্ষেত্রে যে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং দাবীদাওয়া আদায় করবার জন্য একটি রাজনীতিক দলের প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক। জাতির এই বিরাট প্রয়োজন মিটানোর জন্য এগিয়ে এলেন ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ এবং নওয়াব ভিকার-উল-মূল্ক। তাঁদের আহ্বানে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় পাক-ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনেই মুসলিম জাতির আশা আকাংখার প্রতীক 'নিখিল ভারত মুসলিম- লীগ' নামক এক রাজনীতিক সংগঠনের জন্ম হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে এই রাজনীতিক সংগঠনই মুসলিম জাতির রাজনীতিক আশা আকাংখাকে চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। রেনেসাঁর দীপ্ত আলোকে মুসলিম জাতির যে আদর্শিক স্বাতন্ত্র দেদীপ্যমান হয়ে উঠে, মুসলিম রাজনীতিক সংগঠন তাকেই ভিত্তি করে কায়েদে আযমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণা ধিকারকে 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হাসেলের মারফত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

*[আলোচ্য নিবন্ধটি 'তর্জমানুল-হাদীছ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ৩য়-৭ম সংখ্যার আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ থেকে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ইং প্রকাশিত]*

# নোমোফোবিয়ার ভয়াল থাবা ও বাঁচার উপায়

-শো'আইব বিন আসাদ

**উপস্থাপনা :** ছোটবেলায় আমরা একটা রচনা পড়েছিলাম, 'বিজ্ঞান মানব জীবনে আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ'। সেই ভাবনা দিয়ে বর্তমানে মোবাইল ফোনকে নিয়ে চিন্তা করা সময়ের দাবী। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও নতুন নতুন ডিভাইসের প্রতি শিশু-কিশোরদের আকর্ষণ থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ এই বয়সে তাদের নতুন কিছু জানার আগ্রহ থাকে; কিন্তু এই সকল শিশু যখন মোবাইল গেমসসহ নানা ক্ষতিকর বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন তা তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে তারা খেলাধুলা করতে চায় না, খেতেও চায় না। বরং মোবাইল ফোন ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। এটা একটি মানসিক রোগ। যাকে নোমোফোবিয়া বলা হয়, যা লেখাপড়া, ক্যারিয়ার ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে এক ভয়ংকর প্রতিবন্ধক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

**নোমোফোবিয়া :** No Mobile Phobia শব্দটির সংক্ষিপ্তরূপ Nomophobia। কোনো জিনিসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যখন মানসিক অস্থিরতা, ভয় বা উদ্বেগ তৈরী করে, তখনই সেটিকে Phobia 'ফোবিয়া' বলা হয়। আর ফোন হারিয়ে গেলে বা ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেলে বা যে কোন কারণে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারলে যদি অনেক বেশী অস্থিরতা ও মানসিক চাপ তৈরি হয় তাকে 'নোমোফোবিয়া' বলা হয়।

**নোমোফোবিয়ার করাল ছোবল :** সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গবেষণায় দেখা গেছে, নোমোফোবিয়ার মতো মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত এক-তৃতীয়াংশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পড়ুয়া ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ৫৮৫ জন স্মার্টফোন ব্যবহারকারী শিক্ষার্থী এ জরিপে অংশ নেন। গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৃদু নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত ৯ দশমিক ৪ শতাংশ, মাঝারি নোমোফোবিয়ায় ৫৬ দশমিক ১০ শতাংশ এবং গুরুতর নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীর হার ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ।

২০১৩ সালে করা একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্তত ৯ শতাংশ মানুষ প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর নিজেদের মোবাইল দেখেন। বাকীরাও যে খুব একটা পিছিয়ে আছেন তা নয়। এছাড়াও এই পরীক্ষাটিতে আরো জানা যায় যে, বাড়িতে ফোন ফেলে আসা মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৬৩ শতাংশ মানুষ ঐ দিনের পুরোটা সময় হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকেন। ইউগভ এবং হাফিংটন পোস্টের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, অধিকাংশ মানুষই রাতে ঘুমানোর সময় সাথে মোবাইল ফোন না থাকলে অস্বস্তি বোধ করেন এবং ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৬৪ শতাংশ মানুষ মোবাইল ব্যবহার করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েন।

দক্ষিণ কোরিয়ার রেডিওলজির অধ্যাপক ইয়ুং সুক ছই এক গবেষণায় অভিমত দিয়েছেন যে, যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোনে বেশী সময় কাটায় তাদের মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটার ফলে তাদের এ বিষয়ে আসক্তি রয়েছে বলে বাহ্যিক প্রতিয়মান হয়। এর ফলে তাদের মাঝে হতাশা ও উদ্বেগ কাজ করে। তাছাড়া মুঠোফোন সবসময় ঠিক জায়গায় আছে কিনা তা নিয়ে মন সব সময় সতর্ক থাকে। মোবাইল হারানো বা চুরির ভয় থেকে মনের মধ্যে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষত মার্কেটে কিংবা বাইরে গেলে প্রায়ই আমরা পকেটে কিংবা ব্যাগে হাত দিয়ে দেখতে থাকি যে মোবাইল ফোনটা যথাস্থানে আছে কিনা।

২০১৯ সালে ব্রিটেনের ২১৬৩ জন মোবাইল ফোন ব্যবহারীর উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৫৩% ব্যবহারকারীর মধ্যে তাদের মোবাইলফোন হারানো, ব্যাটারী বা ব্যালেন্স শেষ হওয়া, বা নেটওয়ার্ক কভারেজ না থাকায় উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় ৫৮% পুরুষ ও ৪৭% মহিলার ফোবিয়া ছিল এবং ৯% তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকলে অতিরিক্ত চাপ অনুভব করে। ৫৫% ব্যবহারকারী তাদের বন্ধু বা পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারায় উদ্বিগ্ন থাকে।

জার্মানির সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের নোমোফোবিয়া সংক্রান্ত এক জরিপে প্রায় ৮০০ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় অর্ধেকই নোমোফোবিয়াতে ভুগছেন। এ থেকে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

**কীভাবে বুঝবেন আপনি নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত :**

১. ঘন ঘন ফোন দেখতে থাকা। যেন একটা নোটিফিকেশনও বাদ পড়ে না যায়। কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকা। ২. অধিক সময় ফোন ছাড়া থাকতে না পারা এবং ক্রমাগত ব্যবহার করার প্রবণতা ও ইচ্ছা। এক কথায়, যে কোন মূল্যে মোবাইল ফোন হাতে, পকেটে বা কাছে রাখা নিশ্চিত করা। ৩. মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারলে দুশ্চিন্তা, ভয়, প্যানিক বোধ করা। এমনকি ফোন ছাড়া নিজেকে অসহায় মনে করা। ৪. মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারলে খিটখিটে মেজাজ, মানসিক চাপ বোধ করা এবং অস্থির আচরণ করা। ৫. অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের কারণে প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সমস্যা ও এই আসক্তির

কারণে জীবনযাত্রার মান অথবা স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া। ৬. কেউ কেউ ফোন বিছানায় নিয়ে ঘুমায়, আবার বাথরুমেও নিয়ে যায়। ৭. অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের কারণে ঘুমের ক্ষতি।

**নোমোফোবিয়া হওয়ার কারণ?**

১. নিঃসঙ্গতা একটি বড় কারণ। ২. অন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করা বা যোগাযোগ কমে যাওয়া। ৩. আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং সামাজিক পরিবেশে মুখোমুখি যোগাযোগের অদক্ষতা। ৪. দিনের বেশীরভাগ সময় মোবাইলের স্ক্রীনে সময় দেওয়া। এখানে স্ক্রীন থেকে নির্গত ব্লু লাইট অ্যাডিকশন তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ৫. আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ মোবাইল ফোনের অগ্রহণযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজা।

**ক্ষতিকর দিক :**

১. এটি উদ্বেগ তৈরী করে। ফোন থেকে দূরে থাকলে এই রোগে আক্রান্তরা উদ্বেগে ভোগেন। যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া এর ফলে মনোযোগও নষ্ট হয়। যার ফলে কর্মস্থলে উৎপাদনশীলতাও কমে আসে।

২. সময়ের অপচয় করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মাল্টিটাস্কিং বা একই সময়ে একাধিক কাজ করা ক্ষতিকর। কারণ এভাবে তথ্য ধারণ ও প্রসেস করা যায় না। অনবরত ফোন চেক করলে সময়ের অপচয় হয় প্রচুর।

৩. ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ফোন থেকে যে নীল আলো নিঃসরণ হয় তা মস্তিষ্কে এই সংকেত দেয় যে, এখন ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়। যা ঘুমের জন্য সহায়ক মেলাটোনিন হরমোনকে দমন করে। *(দৈনিক কালের কণ্ঠ ৬ই এপ্রিল ২০১৭)*।

**নোমোফোবিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় :**

১. দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় মোবাইলকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখুন। তার মানে এই নয় যে, সেই সময় আপনাকে ফোন করলে কেউ পাবে না। তবে মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রেখে, সেটাকে একটু দূরে রেখে দিন যাতে করে কেউ আপনাকে ফোন করলে খুঁজে পায়। কিন্তু এর বেশী কিছু নয়।

২. ঘুমানোর সময় মোবাইল দূরে রাখুন। সম্ভব হলে বন্ধ কিংবা সাইলেন্ট করে রাখুন। কিছুদিন এই পদ্ধতি মেনে চললে আপনার চারপাশের মানুষ ব্যাপারটি বুঝতে পারবে এবং রাতের নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর আপনাকে আর কল করবে না। ঘুমের ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট সময় মেনে চলুন। অনেকেই রাতে ঘুম না আসার কারণে মোবাইল ব্যবহার করেন এবং খানিক পর ঘুম আসলেও আর মোবাইলের কারণে ঘুমাতে পারেন না। তাই ঠিক সময়ে প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়ুন। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হবে।

৩. কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগে? কোনো কাজ করতে গেলে সময় কেটে যায়? এই মানুষ এবং কাজগুলোকে চিহ্নিত করুন এবং এই ব্যাপারগুলো নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। বিনা কারণে ফোনের দিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার সমস্যা একটু হলেও কমে যাবে।

৪. বাসায় কিছুক্ষণের জন্য ফোন রেখে বাইরে বের হওয়ার অভ্যাস করুন। যখন আপনি হাঁটতে যাবেন অথবা গলির মোড়ের দোকান থেকে কিছু আনতে যাবেন তখন মোবাইল ছাড়াই বের হবেন।

৫. মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করুন। চেষ্টা করুন ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপে এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের। বর্তমানে আমাদের মোবাইল আসক্তি এবং নোমোফোবিয়া নামক মানসিক সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তাই এর ব্যবহার কমিয়ে ফেলুন। এতে করে সমস্যা একটু হলেও দূর হবে।

৬. নোটিফিকেশন অপশনগুলো বন্ধ রাখুন। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো বন্ধ রাখুন। কারণ সেগুলোও মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।

৭. দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ব্যবহারের পরিবর্তে দৈনিক কিছু বই পড়ার অভ্যাস করুন। চিঠি লেখা, হাঁটাহাঁটি বা বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

৮. মসজিদে গিয়ে দীর্ঘ সময় যিকির-আযকার ও তেলাওয়াতের অভ্যাস করুন। মোবাইলে অন্য কাজের পরিবর্তে কুরআন ডাউনলোড করে নিয়মিত পড়ুন। এতে মোবাইলের অপব্যবহার কমে আসবে।

৯. ফোনে সময় চেক করার বদলে হাতঘড়ি পরুন। হিসাবের জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে যরূরী কথা বলার জন্য বাটন ফোন ব্যবহার করুন।

১০. বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয়জনের সঙ্গে ফোনে কথা বলা কমিয়ে দিয়ে মুখোমুখি দেখা করার সুবিধাজনক নিয়ম তৈরি করুন। যদি তারা অন্য শহরে থাকেন তাহলে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কথা বলার অভ্যাস করুন। অফলাইনে সামাজিক যোগাযোগ রাখার যে অভ্যাসটা করোনাকালীন সময় আমাদের চলে গিয়েছিল সেটিকে আবার সজীব করুন।

**উপসংহার :** নোমোফোবিয়ার কারণে শুধু দৃষ্টিশক্তি নয়, শ্রবণশক্তি, শরীরের অস্থিসন্ধিগুলো ও প্রজননতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফোনের হাই ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের সাথে মস্তিষ্ক ক্যান্সারের যোগসূত্র রয়েছে। এর কারণে ঘুমের যে সমস্যা হয় তার নাম ইনসমনিয়া বা স্পিং ডিসঅর্ডার। মোদ্দাকথা, বিজ্ঞানের অনন্য আবিষ্কার মোবাইল ফোন এড়িয়ে চলার উপায় না থাকলেও এর অপব্যবহার যেন না হয়, দিন দিন যাতে ছেলেমেয়েরা এর প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়ে, সেজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা খুবই যরূরী।

*[লেখক : অধ্যায়নরত, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।]*

# মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য

-সারোয়ার মেছবাহ

**ভূমিকা :** মাদ্রাসা শব্দটি শুনলেই আমাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে পাঞ্জাবি-টুপি পরা কিছু মানুষের ছবি, নিতান্তই সহজ-সরল কিছু মুখ। দুনিয়াবী লেনেদেনে যাদের খুব সহজে ঠকিয়ে দেওয়া যায়। মসজিদ, মাদ্রাসা আর পুরাতন দেখতে আরবী, উর্দু কিতাবই এদের জীবন। জীর্ণ কুটিরে ডাল-ভাত খেয়েও যারা মনের তৃপ্তিতে বলে আলহামদুলিল্লাহ। তবে দিনে দিনে সেই কল্পনায় বেশ পরিবর্তন আসছে। আজকের দিনে আর মাদ্রাসা শব্দটি শুনলে সেই পুরাতন সাদা-কালো ছবি কল্পনায় ভেসে ওঠে না। আজকে মাদ্রাসা আধুনিক মাদ্রাসা হয়েছে। আরো একধাপ এগিয়ে অত্যাধুনিক হয়েছে বললেও ভুল হয় না। তালেবে ইলমদের পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি আদব-আখলাক, ইখলাছ-আমল সবকিছু রেঙেছে রংধনুর সাত রঙে। বাহ্যিক কাঠামোগত পরিবর্তনের পাশাপাশি জীবনের লক্ষ্য ও গতিধারায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। যার ফলে দিনে দিনে একটি দুনিয়ালোভী আলেম সমাজ গড়ে উঠছে। এই অবস্থার পরিবর্তন এখন সময়ের দাবী।

আজ আমি তালেবে ইলমদের চোখ থেকে রঙিন চশমা সরিয়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে চাই উম্মুল মাদারিস মাদ্রাসাতুছ ছুফফায়। পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ছুফফার সেরা ছাত্র আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে। কেমন ছিল তাঁর জীবনধারা, ক্যারিয়ার ভাবনা। কী ছিল তাঁর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য। তাঁদের চোখে কেমন ছিল এই জৌলুসভরা দুনিয়া।

**আছহাবুছ ছুফফাহ :** ছুফফাহ শব্দের অর্থ ছাপড়া ঘর, শামিয়ানা, ঘরের চাল ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃস্ব ও স্বজনহারা একদল ছাহাবী মসজিদে নববীর পাশে একটি ছাপড়া ঘরে বসবাস করতেন। তাঁদেরকে আহলুছ ছুফফাহ বা আছহাবুছ ছুফফাহ বলা হ'ত। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ৭০-এর অধিক। আজ যেমন আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে মাদ্রাসায় এক ছাদের নিচে জমা হয়ে পড়ালেখা করি, তেমনই তাঁরাও মাসজিদে নববীর পাশে এক ছাদের নিচে একত্রিত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের সেই মাদ্রাসা আমাদের মাদ্রাসার মত বিলাসবহুল ছিল না। আমাদের মত তিন বেলা পেটপুরে খেয়ে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়নি। বরং তাঁরা ক্ষুধার তাড়নায় কখনো কখনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

তাঁদের অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা আছহাবুছ ছুফফার অন্যতম সদস্য আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর থেকে জানব। তিনি বলেন, আমি আছহাবুছ ছুফফার ৭০জনকে দেখেছি, তাদের গায়ে কোনো বড় চাদর ছিল না। কারো ছিল শুধু লুঙ্গী, আবার কারো ছিল শুধু একটি ছোট চাঁদর। সেটাকেই তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। সেটা কারো অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত আবার কারো টাখনু পর্যন্ত ঝুলে থাকত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তাঁরা কাপড়ের দুইধার হাতে ধরে একত্রিত করে রাখতেন'।[১]

এই সেই আবু হুরায়রা (রাঃ) যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর থেকে ৫৩৭৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যা ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে সর্বোচ্চ। তাঁর থেকে প্রায় আট শতাধিক তাবেঈ হাদীছের জ্ঞান আহরণ করেছেন। আমরা আজকের যুগে তাঁর ইলমের প্রশংসা করছি এমনটা নয়, সে যুগেও তাঁর ইলমের প্রশংসা ছিল। তিনি নিজেই এবিষয়ে বলেছেন, আপনারা বলে থাকেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আবু হুরায়রা (রাঃ) বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। একথাও বলেন, মুহাজির ও আনছারদের কী হ'ল যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন না? মূল ব্যাপার হল এই যে, যখন আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন তখন আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে বা না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকটে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষণ করতাম'।[২] এই হল আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইলম সাধনা। সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনা করার ভেদ।

এখন প্রশ্ন হ'ল, তাঁরা কি সুনাম অর্জন বা দুনিয়া অর্জনের জন্য ইলম শিক্ষা করতেন? তাঁরা কি খুব বড় আলেম বা বক্তা হিসাবে নিজেকে যাহের করার উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পড়ে থাকতেন? ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য আসলে কী হওয়া দরকার? এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, সেই জ্ঞান কেউ দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করলে সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না'।[৩] নিশ্চয়ই এই জ্ঞান সেই জ্ঞান যেটা আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা দেয়া হয়। এই জ্ঞান বিশুদ্ধ অহির জ্ঞান– কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান।

যদি আমরা তাঁদের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির দিকে তাকাই তাহ'লে ফাযালা ইবনে উবায়দ (রাঃ) এর হাদীছ দেখতে পাই। তিনি বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন লোকদের নিয়ে ছালাতে দাঁড়াতেন তখন কিছু লোক ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় দাঁড়ানো থেকে ছালাতের মাঝেই পড়ে যেতেন। এরা ছিলেন, আছহাবুছ ছুফফাহ বা ছুফফার সদস্য। এমনকি

১. বুখারী হা/৪৪২, 'ছালাত' অধ্যায়।
২. বুখারী হা/১৯১৯, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৩. আহমাদ হা/৮২৫২ সনদ ছহীহ।

তাদের এই অবস্থা দেখে মরুবাসী আরবরা বলত, এরা পাগল নাকি! রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করে এদের দিকে ফিরতেন এবং বলতেন, তোমরা যদি জানতে আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্য কী নে'মত আছে? তাহ'লে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত থাকতে, আরো অভাবী থাকতে ভালবাসতে। ফাযালা (রাঃ) বলেন, আমি ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) এর সাথেই ছিলাম'।[৪]

একবার চিন্তা করুন, যাঁদের পেটে খাবার না থাকার কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন না। সম্বল মাত্র একটি লুঙ্গী বা চাঁদর, যা পরে কাপড়ের দুই পার্শ্ব হাত দিয়ে ধরে না থাকলে লজ্জাস্থান বের হয়ে যাবার ভয়; তাঁদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা আরো অভাবী থাকতে ভালোবাসতে! এই ছিল আমাদের উম্মুল মাদারিস আহলে ছুফফাহ্র অবস্থা। এই ছিল সেখানকার গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ভাবনা। এটাই ছিল তাঁদের জীবনধারা।

**আমাদের বর্তমান মাদ্রাসাগুলোর ভিত্তি :** শুনতে খারাপ লাগলেও বলতেই হবে যে, আমাদের বর্তমান মাদ্রাসাগুলো দুনিয়ামুখী চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে উঠছে। তারা কুরআন-হাদীছ পড়াচ্ছে, একথা ঠিক। তবে এই বিদ্যার মাধ্যমে তারা দুনিয়া উপার্জন করছে এবং শিক্ষার্থীদেরকেও দুনিয়া উপার্জনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কুরআন-হাদীছের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যে যত বেশী দুনিয়া উপার্জন করতে পারছে সে ততই অনুসরণীয় হয়ে উঠছে। কুরআন হাদীছ সবখানেই শিখানো হচ্ছে, কম বা বেশী। তবে ইখলাছ এবং লিল্লাহিয়্যাতের শিক্ষা কোথাও যেন দেওয়া হচ্ছে না। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যদি ইখলাছের শিক্ষা না থাকে তবে সেই মাদ্রাসা আর স্কুল-কলেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এ অবস্থায় স্কুল-কলেজে পড়ে হয়ত কিছু দুনিয়া অর্জন হয়, তবে ইখলাছ ছাড়া মাদ্রাসায় পড়ে না হয় দুনিয়া, না হয় আখেরাত।

আমাদের মাদ্রাসাগুলো যে দিন দিন ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠছে, এই কথাটিও বলতে খারাপ লাগে। আপনি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, একই বাজারে দুই তিনটা মাদ্রাসা! একধাপ বেড়ে বলা যায় একই বিল্ডিংয়ের আলাদা আলাদা ফ্লোরে আলাদা আলাদা মাদ্রাসা! এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয় প্রাইভেট মাদ্রাসা। আপনি জরিপ করলে দেখবেন, অধিকাংশ প্রাইভেট মাদ্রাসার পরিচালকই ভালো আলেম নন। অনেকে তো ভালো খারাপ দূরে থাক, আলেমই নন। আর মুখলিছ আলেমে দ্বীন তৈরীর ব্রতী নিয়েও তারা মাদ্রাসা চালু করেননি। সে সকল মাদ্রাসার লিফলেটে আপনি সব আন্তর্জাতিক মানের কথা পাবেন! পাঁচ বেলা খাবার থেকে শুরু করে যত রকমের সার্ভিস আর বিশ্বের নামজাদা ওস্তাদ যেন সব সেখানেই আছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, সব প্রাইভেট মাদ্রাসাতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র আছেই। এটা না হ'লে যেন লিফলেটই হয় না।

এগুলো কোনো দোষের বিষয় নয়। বাজারে বাজারে নয়, ঘরে ঘরে মাদ্রাসা হ'তে পারে। তবে সে মাদ্রাসার বুনিয়াদ হ'তে হবে ইখলাছের ওপর। অন্য যে নিয়তেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হোক তা তালিবে ইলমদের মধুর নামে বিষই পান করাবে। যা পান করলে তালিবে ইলমদের অকাল মৃত্যু নিশ্চিত। প্রচলিত মাদ্রাসাগুলোতে মধুর পাত্রে বিষ মিশানো হয় তখন, যখন একজন শিশু তাদের কাছে কুরআন হিফয করার জন্য ভর্তি হয়। আর সেই শিশুর মাথায় ঢুকানো হয়, তোমাকে আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় দুবাই থেকে পুরস্কার আনতে হবে! এটার জন্য তোমাকে ভালো ইয়াদ করতে হবে। অমুক তমুক ক্বারীর লাহানে তিলাওয়াত করতে হবে। এটাই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! তাদেরকে সারাদিন মশক করানো হয়। আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতার জন্য যা করা লাগে তাই করানো হয়। ফলে কুরআন হিফযের উদ্দেশ্য হয় দুনিয়াবী যশ, ইহকালীন খ্যাতি। সে ছেলেটি জানতেই পারে না, কুরআন হিফয কেন করতে হয়! দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করলে তার ভয়াবহতা কী! ফলে একদিন সে দুবাই, সাঊদী আরব, কাতার থেকে পুরস্কার নিয়ে নিজেকে চূড়ান্তভাবে সফল মনে করে। আর ওদিকে এই ফলাফলকে পুঁজি করে মাদ্রাসা পরিচালক সর্বোচ্চ ফায়দা কুড়ান। এভাবেই চলে আসছে এই প্রাইভেট ব্যবস্থা। এভাবেই চলে আসছে কুরআন-হাদীছের জ্ঞানকে পুঁজি করে ব্যবসা। তারা ব্যবসা করুক, তবে একজন তালেবে ইলমের আখেরাত নষ্ট করে কেন! একজন তালেবে ইলমের ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য নষ্ট করার অধিকার তাদের কে দিল!

কিছু মাদ্রাসা এমনও দেখেছি, যোগ্য আলেম গড়ে তোলার তুলনায় প্রচারেই তাদের খেয়াল বেশী। কুরআন হাদীছ শিক্ষার মান অধঃতলে নাকি রসাতলে এদিকে তাদের খেয়াল নেই। অথচ চার আনার পয়সাকে ষোল আনার রূপ দিয়ে জনসম্মুখে প্রচার করতে তারা বেশ পারদর্শী। মোটেও ইংরেজী পড়ানো হয় না এমন মাদ্রাসার সভা, সেমিনারে ছাত্রদেরকে ইংরেজী রচনা মুখস্থ করিয়ে ইংরেজী বক্তব্য উপস্থাপন করিয়ে তারা কী প্রচার করতে চান? দেয়ালিকায় বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় লেখা প্রকাশের মাধ্যমে কী বুঝাতে চান? সেখানে যারা বক্তব্য দেয়, লেখা জমা দেয় তারা নিজেরাও জানেনা, লেখাতে বা বক্তব্যে আসলে কী বলা হ'ল। এটাই কি তাদের মুখলিছ আলেম তৈরীর নমুনা?

দেখুন! শুধু ফার্সী কবিতা আর ইংরেজীতে বক্তব্য করতে পারলেই যোগ্য আলেম হয় না। যোগ্য আলেম বানাতে ছাত্রদের মাঝে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন শক্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা করতে হয়। নাহু, ছরফ, বালাগাতে দক্ষ করে তুলতে হয়। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, তালেবে ইলমকে মুখলিছ এবং আখেরাতমুখী করে গড়ে তুলতে হয়। কারণ, আলেমগণ যদি দুনিয়াদার হয় তবে জাতি অভিভাবকশূন্য হয়। আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্র প্রতিবছর দাওরায়ে হাদীছের গণ্ডি পেরিয়ে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করছে কিন্তু জাতি পাচ্ছে না তাদের রাহবার। পাওয়া যাচ্ছে না দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম।

৪. তা'লীকুর রাগীব ৪/১২০, তিরমিযী হা/২৩৬৮ সনদ ছহীহ।

আরো দুঃখের বিষয় হল, আমাদের কিছু ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসাও গড়ে উঠেছে। তারা খুব সুক্ষ্মভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ কিংবদন্তী তারকাদের আমাদের থেকে কেড়ে নিচ্ছেন। তারা বলেন, ভালো আলেম হয়ে সেই ইলম তো বহির্বিশ্বে প্রচার করতে হবে। এজন্য ইংরেজী বোঝা ও কথা বলার দক্ষতা অর্জন করা অবশ্যই দরকার। সে লক্ষ্যে ইংরেজী ভাষা শেখানোর জন্য আরবীর তুলনায় বেশী বেতন দিয়ে শিক্ষক রাখা হয় এবং আরবীর তুলনায় ছাত্রদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় বেশী আগ্রহী করে তোলা হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, বেশীর ভাগ ছাত্র ইংরেজী তো শিখে যায় কিন্তু লেখাপড়ার শেষ অবস্থায় এসেও একলাইন আরবী শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে, বলতে সক্ষম হয় না। অথচ এই ছাত্রগুলো বড় আলেম হওয়ার জন্যই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিল। আজ তারা কুরআন বুঝে না, হাদীছ বুঝে না, ফিক্বহ বুঝে না, ইলমে শরী'আর কোনোটাই বুঝে না। ফলস্বরূপ খুতবায় মানুষকে কুরআন-হাদীছ শোনানোর বদলে ইংরেজী স্পোকেন শুনিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করে। বিষয়টা অনেকটা গাভী কেনার টাকা দিয়ে দুধ দোহনের সারঞ্জাম কিনে গাভী কেনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলার মত।

**শেষ কথা :** হেজাযের কাফেলা তুর্কিস্তানের পথ ধরে কখনো হেজাযে পৌঁছাতে পারে না। আজ আমাদের কাফেলা যে পথ ধরে এগিয়ে চলেছে সে পথ আমাদের নয়। এই ক্যারিয়ার ভাবনা আমাদের নয়। এই জীবনধারা আমাদের নয়। বিশ্বের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান টিকিয়ে রাখার একেকটি দুর্গ। জানিনা, সেই দূর্গের সৈনিকদের মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল, আলেম হওয়ার পাশাপাশি তোমাকে ভালো ডাক্তারও হ'তে হবে। ভালো ইঞ্জিনিয়ারও হ'তে হবে। ভালো বক্তাও হ'তে হবে। হ্যা, ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি আলেম হওয়া যায়। তবে সেই আলেম শুধু নিজেকে ফিতনা থেকে রক্ষা করতে পারে; কুরআন হাদীছের দুর্গ রক্ষার কাজ তার দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ, কুরআন-হাদীছের দূর্গ রক্ষার জন্য প্রয়োজন আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মত নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের। আবু দারদা (রাঃ) এর মত দুনিয়াবিমুখ কিছু মানুষের। ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে ইসলামের যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা দুনিয়াবিমুখ মানুষদের মাধ্যমেই হয়েছে।

আমাদের পূর্বসূরীগণ যদি একটি হাদীছ জানার জন্য মদীনা থেকে দামেশ্ক পায়ে হেঁটে সফর না করতেন, রাতের পরে রাত শুধু ছাদাক্বায়ে জারিয়ার উদ্দেশ্যে ইলম সাধনায় অতিবাহিত না করতেন, পারিশ্রমিক নেই, বেতন নেই, রোজগার নেই বলে বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাবাদি রচনা করে না যেতেন, তবে আমরা মূর্খতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতাম। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। এরা যদি কুরআন হাদীছের জ্ঞান কিছু অর্জন করেও ফেলে তবুও এদের মাধ্যমে পেটপুঁজা ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। কারণ, কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের জন্য ইখলাছ তেমনই প্রয়োজন যেমন মাছের জন্য পানি প্রয়োজন।

প্রিয় তালেবে ইলম! মাদ্রাসা সভ্যতা এসেছে মসজিদে নববীর বারান্দা থেকে। আহলুছ ছুফফাহ থেকে। আমরা যদি সত্যিই মাদ্রাসা থেকে প্রকৃত আলেম এবং দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম হ'তে চাই তবে আমাদেরকে আবার পুরাতন ধারায় ফিরে যেতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে, আখেরাতের জীবনই আসল জীবন এবং সেই জীবনের পুঁজি সংগ্রহের জন্যই কাজ করে যেতে হবে। দুনিয়ার বুকে ভালো খেয়ে পরে আরাম আয়েশ করে যাওয়ার জন্য আমরা দুনিয়াতে আসিনি। বিশ্বকে আমাদের কিছু দেওয়ার আছে। আমাদের কাছে তাদের কিছু পাওনা আছে। তাই এসো, পরলৌকিক জীবনের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়ার নিবৃত্তে ইলম সাধনা করি। এসো, আবার রাত জাগি। এসো, আমাদের পূর্বসূরিদের মত আমরাও ইলমের ময়দানে অবদান রাখি। জশ, খ্যাতি বা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে নয় বরং জান্নাত লাভের জন্য ইলম অর্জন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

## তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। -*সম্পাদক*।

**তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।**

# বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

-সাইফুর রহমান

**ভূমিকা :** ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম নয়, একটি সভ্যতার স্রষ্টাও। ইসলামী সভ্যতা অজ্ঞতা ও মূর্খতার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম উদ্দীপনার যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, তারই ঔজ্জ্বল্য সুপ্ত মানবতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বিপণ্ন মানুষ্য-হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, বিবর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির বিশীর্ণ বিশুষ্ক বিবরে, মানবীয় জীবনের প্রত্যন্ত ক্ষেত্রে, সৃষ্টি ও সংস্কারের অন্বেষা ও অভিযানে প্রগতি ও সমৃদ্ধির বিদ্যুৎকেন্দ্র সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বিজ্ঞানের বদান্যতায় মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখলে মনে হয় তারা ধনে এবং জ্ঞানে দরিদ্র। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। যে জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানবকল্যাণ *(আলে ইমরান ৩/১১০)* এবং সমগ্র পৃথিবীতে তারা জ্ঞানের মহিমা প্রচার করবে, পৃথিবীকে শাসন করবে, আল্লাহ্র অসামান্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে, কিন্তু তারা কেন আজ এমন অসহায়? তারাই আজ সবচেয়ে বেশী অত্যাচারিত? কেন তারাই আজ জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণায় সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদতা থেকে ফিরে আসতে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস নিজেকে নতুন উদ্দীপনায় জাগ্রত করতে হবে।

**বিজ্ঞানের উৎস আল-কুরআন :** আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয়' *(যুমার ৩৯/০৯)*। ইসলামে বিদ্বান ব্যক্তির বহু মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মুসলমানদের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল তা মুসলমানরাই কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞানের মশালকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। জন্ম দিয়েছিলেন মানব ইতিহাসের একটি অনন্য সাধারণ অধ্যায়ের, যে অধ্যায়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন কট্টরপন্থী অনেক ইসলাম বিদ্বেষীও'।[১]

দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে ইসলাম নে'মত ও রহমত বিবেচনা করে। মানবকল্যাণে গবেষণা, চিন্তা এবং মননশীলতাকে ইবাদত ভাবে। কুসংস্কারে কিলবিল ধর্মবিশ্বাস ইসলামে নেই। গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও এখানে পুরস্কারের নিশ্চয়তা দেয়। আর সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা তো রয়েছেই। সভ্যতা দাঁড়াতে হ'লে, সংস্কৃতি ভাল করতে হ'লে প্রযুক্তির উৎকর্ষ এগিয়ে নিতে হ'লে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রেরণা দানকারী বিশ্বাস যরূরী যা শুধু অখণ্ডভাবে ইসলামই দিয়েছে'।[২]

আধুনিক বিজ্ঞানের এখন চলছে চরমোৎকর্ষকাল। আজও পবিত্র কুআনের কোন বক্তব্যকে এই বিজ্ঞান অসার প্রমাণ করতে পারেনি। বরং এ বিষয়ে ফ্রান্সের প্রখ্যাত গবেষক ডা. মরিস বুকাইলি বলেন, 'কুরআনে এমন একটি বর্ণনাও নাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার বিরোধিতা করা যেতে পারে'।[৩]

তাই আমরা বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন নয়; বরং কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানকে বুঝার চেষ্টা করব। কারণ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল অজানাকে জানা। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ফলাফলের আলোকে পুনঃপুনঃ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান কখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ মানবীয় জ্ঞান কখনো সম্যক ও সর্বব্যাপক জ্ঞান হ'তে পারেনা। অথচ কুরআন এমন এক ঐশী বাণী যা অজানাকে জানার এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল তথ্যের এক বিপুল সমাহার। এ অর্থে বিজ্ঞান কুরআনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কারণ কুরআনের অন্যতম মোজেযা হ'ল সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া'।[৪]

বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষতার সাথে সাথে পবিত্র ইসলামের শাশ্বত পয়গাম আরো বেশী করে প্রমাণিত হচ্ছে। আধুনিক যুগের মানুষ ঝুঁকে পড়ছে সর্বাধুনিক ধর্ম ইসলামের প্রতি। উল্লেখ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিক সমাধান যাই হৌক না কেন, ইসলাম তার আনুগামী নয়, বরং বিজ্ঞানকেই বারবার ফিরে আসতে হয়েছে ইসলামের কাছে। বিজ্ঞান আজ যা শত বছরের গবেষণায় প্রমাণ করছে, তা কোন গবেষণা ব্যতীত ইসলাম তথ্যগত বুৎপত্তিসহ বর্ণনা করেছে। ফলে আজকের বিজ্ঞান কুরআনের কাছে বারংবার হার মানছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দর্পণ 'কুরআন' সকল সময়ের সর্বাধুনিক বিজ্ঞান গ্রন্থ।[৫]

অথচ পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম পাঁচটি আয়াতে প্রথমে পড়ার কথা বলা হ'ল এবং তারপর কলমের কথা কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় কোটি কেটি মুসলিম জনগোষ্ঠী আজও কলম ব্যবহার করতে জানে না। কুরআনের বহু জায়গায় 'ইল্ম' এর কথা বলা হয়েছে। 'ইলম' অর্থ জ্ঞান, আবার 'اقرأ' এর আরবী অর্থ পড়ো।[৬]

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম অহি হ'ল সূরা আলাক্বের প্রথম ৫ আয়াত। মূলত এ ৫টি আয়াতের মাধ্যমেই বিজ্ঞান চর্চার

১. মুহাম্মাদ নুরুল আমীন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, (ঢাকা : প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২), ৯ পৃ.।
২. মাসুদ মজুমদার, মাসিক রহমত 'ইসলাম বিরোধী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব এবং আমরা' (ঢাকা : মে ২০০৪), ১১ পৃ.।
৩. ডা. মুরিস বুকাইলি, অনুবাদ ওসমান গনি, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান (ঢাকা : আল-কোরআন একাডেমী ২য় মুদ্রণ মে ২০০১), ১৬ পৃ.।
৪. আল-কুরআন ও প্রাণীবিজ্ঞান, ১৩ পৃ.।
৫. মুহাম্মাদ রুহুল আমিন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান (ঢাকা : ৪র্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৮), ১৭ পৃ.।
৬. মুহাম্মাদ নুরুল আমীন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, (ঢাকা : প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২) ০৯ পৃ.।

নানাবিধ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। ১ম আয়াত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ– ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক্ব ৯৬/১)*। আলোচ্য আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২য় আয়াতে خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ– ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ’তে’ *(আলাক্ব ৯৬/২)*। আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির সাথে সাথেই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ৩য় আয়াত اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ– ‘পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু’ *(আলাক্ব ৯৬/৩)*। আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বিজ্ঞান চর্চার ফলে নাস্তিক হয়ে যেয়ো না; বরং সঠিক পথে বিজ্ঞানচর্চায় রত থেকে একত্ববাদ স্বীকার কর।

৪র্থ আয়াত الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ– ‘যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন’ *(আলাক্ব ৯৬/৪)*। আলোচ্য আয়াত দ্বারা হাতে-কলমে শিক্ষা তথা Laboratory গবেষণাকে বুঝানো হয়েছে। ৫ম আয়াত عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ– ‘শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’*(আলাক্ব ৯৬/৫)*। আলোচ্য আয়াত দ্বারা সর্বশেষ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, অজানাকে জানার নামই হ’ল বিজ্ঞান।[৭]

**বিজ্ঞান শব্দটির বিশ্লেষণ :** বিজ্ঞান শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় বি + জ্ঞান’ যার অর্থ দাঁড়ায় বিশেষ জ্ঞান বা অনুপুঙ্খ জ্ঞান। অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান। মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান বা অনুপুঙ্খ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে يَفْقَهُونَ শব্দটি এসেছে ১৩ বার, يَفْقَهُوهُ শব্দটি এসেছে ৩ বার, يَفْقَهُوا শব্দটি এসেছে ১ বার, نَفْقَهُ শব্দটি এসেছে ১ বার। لَا تَفْقَهُونَ শব্দটি এসেছে ১ বার, لِيَتَفَقَّهُوا শব্দটি এসেছে ১ বার, تَتَفَكَّرُونَ শব্দটি এসেছে ৩ বার, يَتَفَكَّرُوا শব্দটি এসেছে ২ বার, يَتَفَكَّرُونَ শব্দটি এসেছে ১০ বার, يَعْلَمُ শব্দটি এসেছে ৭১ বার, عِلْم শব্দটি এসেছে ৫৮ বার, الْعِلْم শব্দটি এসেছে ২৮ বার, تَعْلَم শব্দটি এসেছে ৯ বার, تَعْلَمُوا শব্দটি এসেছে ৫ বার, يَعْلَمُوا শব্দটি এসেছে ৫ বার। এছাড়াও النَّظْرُ، الحِكْمَةُ الرُّؤيَةُ، التَّفَكّرُ، التَّدَبُّرُ ইত্যাদি শব্দযোগে মোট ৭৫৬টি আয়াতে ‘বিজ্ঞান’ মূলক শব্দ ব্যবহার করে মানবজাতিকে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে’।[৮]

অন্য এক গবেষণায় দেখা যায় যে, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে নিম্নসংখ্যক আয়াত সমূহ রয়েছে। যেমন : (১) মেডিসিনে ৩৫৫টি (২) বায়োলজী ও বোটানিক ১০৯টি (৩) এ্যাস্ট্রোনমী ও এ্যাস্ট্রোফিজিক্সে ৮২টি (৪) কেমিস্ট্রিতে ৪৩টি (৫) মেটেরিওলজীতে ৩৪টি (৬) জিওলজীতে ৩৩টি (৭) ওসীয়ানোগ্রীতে ৩১টি (৮) জুয়োলজীতে ২৮টি (৯) জিওগ্রাফীতে ১৭টি (১০) আর্কিওলজীতে ৮টি (১১) এয়ারোনটিক্সে ৮টি এবং (১২) সোশিওলজীতে ৩০০টি, সর্বোমোট ১০৪৮টি আয়াত’।[৯]

আরেকটি হিসাবে জানা যায় যে, কুরআনের শতকরা ১১টি আয়াত বিজ্ঞান বহন করে। প্রকৃত অর্থে কুরআন ও হাদীছের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যই বিজ্ঞান বহন করে’।[১০]

**বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান :**

বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় মুসলমানদের অবদান ছিল অসাধারণ ও চমকপ্রদ। বিজ্ঞানের এমন কোন অঙ্গন ছিলনা যেখানে মুসলমানরা বলিষ্ঠ ও সাবলীল পদচারণা ও অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা দীর্ঘ এক হাযার বছর পর্যন্ত বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। জর্জ সাটন যথার্থই উল্লেখ করেছেন, ‘সে যুগে মানবজাতির প্রধান কর্তব্য মুসলমানরাই সম্পাদন করে’। যারা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কয়েকটি মাত্র নাম উল্লেখ করে দিও। তাদের সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সকল সন্দেহের নিরসন ঘটবে। আর সেই নামগুলি হচ্ছে, জাবির ইবনু হাইয়ান আল-কিন্দি, আল-খাওয়ারিজমী, আল ফারাগানী, আল-রাযী, সাবিত ইবনু কুররা, আল-বাত্তানী, হুনাইন ইবনু ইসহাক, আল-ফারাবী ইব্রাহীম ইবনু সিনান, আল-মাসুদী, আত্ব-ত্বাবারী, আবুল ওয়াদা, আলী ইবনু আব্বাস, আবুল কাশেম, আল-বিরুনী, ইবনু সিনা, ইবনু ইউনুস, আল-কারখী, আল-হাইছাম, আলী ইবনু ঈসা, আল-গাজ্জালী, আয-যারকালী ও ওমর খৈয়াম। বিজ্ঞান গগনে এই অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক সমূহের আবির্ভাব ঘটে মাত্র ৩৫০ বছরের পরিসরে। ৭৫০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে’।[১১]

উইলিয়াম ড্রেপার (১৮১১-১৮৮২) স্বীয় Intelectual development of Europe গ্রন্থে বলেন, খুবই পরিতাপের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগণ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের এ বিদ্বেষ বেশী দিন চাপা থাকেনি। নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল’। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) বলেন, তিনি আরব

৭. মুহাম্মাদ নাছের উদ্দীন, সাইন্টিফিক আল-কুরআন (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ ৩য় প্রকাশ ২০১৮) ১৬-১৭ পৃ.।
৮. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ নুরুল আমিন ও মুহাম্মাদ নাজিম, আল-কুরআন ও প্রাণবিজ্ঞান (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ ১ম প্রকাশ জুন ২০২৩) ১৪ পৃ.।
৯. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (রাজশাহী : হাফাবা ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০২২) ৬২ পৃ.।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. সৈয়দ আশরাফ আলী, মাসিক ইতিহাস অন্বেষা ‘ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের জনক’ জুলাই ২০১১, ৪৩ পৃ.।

বিজ্ঞানীদের দ্বারা লাভবান হয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, মুসলমানরাই আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃত'।[১২]

**মুসলিম বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ৩টি যুগ :** (১) হিজরী ২য় শতাব্দীর শুরু থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগে বাগদাদের বিজ্ঞানাগারে বিভিন্ন বিদেশী ও ইউনানী বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ অনুদিত হয়। মি. হাউড বলেন, সমস্ত ইউনানী বিদ্যার এক বিরাট অংশ যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তার সবটুকুই আরবীয় মুসলমানদের অবদান। (২) হিজরী ৩য় শতাব্দী হ'তে ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগে মুসলমানগণ গ্রীক, মিসর, ভারতবর্ষ ও পারস্যের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে তার উপর গবেষণামূলক পর্যালোচনা শুরু করে।

(৩) হিজরী ৪র্থ শতাব্দী হ'তে। এই যুগে মুসলমানগণ আবিষ্কার কার্য শুরু করেন এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা সৃষ্টি করে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই যুগে আবু বকর আল-রাযী (২৫০-৩১১ হি.) আবুল কাসেম আয-যাহরাবী (৩২৪-৪০০), ইবনুল হাইছাম (৩৫৪-৪৩০ হি.), আবু আলী ইবনু সীনা (৩৭০-৪২৮), ওমর খৈয়াম (৪৩৯-৫২৫ হি.) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জন্ম হয়। এরপর থেকে মুসলমানগণ ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মাঁসিয়ে সাদিও তার History of Arab গ্রন্থে বলেন, বাগদাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান যুগে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সে সকল পদ্ধতি আগে থেকেই বাগদাদে ছিল'।[১৩]

স্টেনলি জর্জ মাকিন (১৮৯১-১৯৫২ খৃ.) History of science গ্রন্থে বলেন, খ্রিষ্টীয় ৯ম শতাব্দী ছিল মুসলমানদের গৌরবের যুগ।... সেই যুগের মুসলমানগণ সভ্যতা ও কষ্টের ধারক ও বাহক ছিলেন। কিমস্টন Medical science সম্পর্কে বলেন, 'আরব বিজ্ঞানীগণ শুধু গ্রীক বিজ্ঞানকে জমা করে অনুবাদ করলেই তাদের গৌরবের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এছাড়াও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন গ্রন্থাবলী রচনা করে স্মরণীয় কীর্তি সমূহ রেখে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'রজার বেকনের (১২১৪-১২৯৪ খৃ.) বহুপূর্ব থেকেই আরব বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধানী গবেষণা পদ্ধতি জানতেন'।[১৪]

**আল কিন্দী** একাধারে বারোটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও ছয়টি ভাষাতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং প্রায় ২৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। আল-রাযী প্রায় ২০০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'আল জুদারী ওয়াল হাসাবাহ' নামক পুস্তকটি শুধু ইংরেজী ভাষাতেই চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। জ্ঞানার্জনে তার আগ্রহ তার নিম্নে বর্ণিত বক্তব্য হতেই বুঝা যায়, জ্ঞান সাধনায় আমার আদম্য উৎসাহের ফলেই মাত্র এক বছরে আমি কুড়ি হাযার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি। (প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা করে)। দিবা-রাত্র এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। তবু আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে-শুনিয়ে কিংবা আমার রচনা লেখাই'।[১৫]

**আত্ব-ত্বাবারী** জ্ঞানানুশীলনে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে মৌলিক রচনা লিখেছেন (প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি পৃষ্ঠা)। **আল ফারাবী** দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং ৬টি স্বতন্ত্র বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রায় ৭০টি বিরাট নোটবুকে দর্শন শাস্ত্রের সারাংশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফারাবী এরিস্টটলের আত্মা সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি ১১৩ এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়টি ৪০ বার পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচ্যের সুধী সমাজে এরিস্টটল মুয়াল্লিম আওয়াল বা ১ম শিক্ষক ও ফারাবী মুয়াল্লিম ছানী বা ২য় শিক্ষক হিসাবে পরিচিত'।[১৬]

**উপসংহার :** এক সময় আত্মোন্নয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অমুসলিমরাও মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। আমরা সেই সময়ের কথা বলছি যখন ইউরোপে খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীটি ছিল রাণী ইসাবেলার। যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১০টি। অপরদিকে তৎকালীন ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিল ১০ লক্ষ বই। ঠিক সেই সময়ে অসভ্য ইউরোপে মুসলমানদের আবিষ্কার– 'পৃথিবী গোল' বলার অপরাধে মি. ব্রুণোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, গ্যালিলিওকে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য কারাগারে আটক করা হয়। অবশেষে অন্ধ, বধির হয়ে তিনি সেখানেই মারা যান। কাঁচ, ঘড়ি, বারুদ, মানচিত্র, ইউরোপ থেকে ভারতের রাস্তা এমনকি আমেরিকার আবিষ্কর্তা মুসলমানরা। দুর্ভাগ্য আজ তারাই বিশ্বে সবচেয়ে পশ্চাদপদ জাতি হিসাবে পরিগণিত। কারণ একসময় পৃথিবীর শিক্ষক হলেও এখন তারাই সবচেয়ে কম লেখাপড়া করে।

সম্মানিত পাঠক, জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণায় এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলেই বর্বর, অশিক্ষিত, অমার্জিত, মরুচারী বেদুঈনগণ মুসলমান হওয়ার পরপরই বিজ্ঞান চর্চা করে তৎকালীন বিজ্ঞান জগতের পুরোধায় পরিণত হয়। তারা উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরবর্তী ৩৫০ বছর ধরে বিজ্ঞানের স্বর্ণ শিখরে আটুট থাকে'।[১৭] হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পুনরায় আমাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে পাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

*[**লেখক :** সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]*

১২. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনাসমূহ ৬২-৬৩ পৃ.।
১৩. শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনাসমূহ ৬৩ পৃ.।
১৪. শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনাসমূহ ৬৩-৬৪ পৃ.।
১৫. আহসান হাবীব ইমরোজ, মোরা বড় হতে চাই ৪ পৃ.।
১৬. আহসান হাবীব ইমরোজ, মোরা বড় হতে চাই ৪-৫ পৃ.।
১৭. প্রফেসর ড. আব্দুল জলিল, বিজ্ঞান তথ্য ও প্রযুক্তি (ঢাকা : ইফাবা ১ম প্রকাশ ২০১৬) ১৯ পৃ.।

# বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের উপায়

-ওমর ফারুক

**উপস্থাপনা :** মাতৃভাষা বাংলায় আমরা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারি, মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারি। আমরা অনেকেই মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষা শেখার ইচ্ছা পোষণ করি, প্রশংসার দাবিদার। অধিক ভাষা জানা থাকলে যোগাযোগ ও নতুন নতুন জ্ঞানার্জনে সহায়ক হয়। কিন্তু কোন বিদেশী ভাষার নাম শুনলেই অনেকের মধ্যে অজানা ভীতি কাজ করে। কেন এই ভীতি, তার উৎস আমাদের অজানা। বিদেশী ভাষা বাংলার মতোই আরেকটি ভাষা। মন দিয়ে শিখলে খুব একটা কঠিন নয়। প্রয়োজন হয় শুধু চর্চার। চর্চার অভাবেই বিদেশী ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারছেন না অনেকেই। তাই এই প্রবন্ধে বিদেশী ভাষা চর্চার কিছু পদ্ধতি আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :** বিদেশী ভাষা বলতে মাতৃভাষার বাইরের সব ভাষা। জন্মের পর থেকে মায়ের মুখের ভাষাটাই হয়ে যায় আমাদের ভাষা। ওটাকেই অনেক বেশী আপন করে নেয় মানুষ। তাই একজন মানুষের প্রথম ভাষা হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তার মাতৃভাষাকে। যা সে আপনাআপনি শিখে যায়। অন্যদিকে বিদেশী একটি নতুন ভাষা রপ্ত করা অনেক সময় ও সাধনার বিষয়। কিন্তু বিশ্বায়নের এ যুগে শুধু মাতৃভাষায় পারদর্শী কোনো ব্যক্তির ভিনদেশে ঘুরতে যাওয়ার মতো সাধারণ ব্যাপার থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনে ভালো কিছু করা অনেক বেশী কঠিন। শুধু তাই নয়, একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারলে নিজের মনের ভাব, চিন্তা, গবেষণা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করে বাড়তি শিখে নেওয়া ভাষাগুলো। কারণ তখন বিভিন্ন ভাষার বই ও তথ্যভাণ্ডার থেকে ইচ্ছা মত জ্ঞান আহরণ করা যায়। এছাড়াও গবেষকদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, একের অধিক ভাষায় কথা বলতে পারা মানুষগুলো অন্যদের চাইতে পাঁচ বছর দেরীতে স্মৃতিহীনতায় ভোগেন। সুতরাং মস্তিষ্ককে আরো বেশী সতেজ রাখতে, মনযোগী করে তুলতে এবং কর্মক্ষম রাখতেও ভাষা সাহায্য করে থাকে।

যে কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে মূলত ৪টি বিষয়ে দক্ষ হ'ত হবে। আর তাহ'ল ১. শোনা ২. বলা ৩. পড়া ও ৪. লেখা। যার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

**১. বর্ণমালা শেখা :** প্রথমত যে কোনো ভাষা শেখার জন্য সেই ভাষার বর্ণগুলো কীভাবে যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে হয় সেটা জানা দরকার। বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে না পারলে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে কোনোকিছু পড়তে পারবেন না। বলার পরে সেটা লিখতেও পারবেন না। বর্তমান সময়ে বিদেশী ভাষা শেখার জন্য অনেক এ্যাপ, অডিও-ভিডিও টিউটরিয়াল পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে খুব সহজে পসন্দের ভাষা শেখা সম্ভব।

**২. শিশুর মতো শিখুন :** আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন, শিশুরা কেবল ভালো শিক্ষার্থীই নয়, তারা দ্রুত শিখতেও সক্ষম। কারণ, শিশুদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ঝক্কি-ঝামেলা নিয়ে ভাবতে হয় না; সেকারণ তাদের মন সক্রিয় থাকে। হ্যাঁ, এটা সত্য। কারণ তারা শেখার প্রক্রিয়া উপভোগ করে এবং তারা ভুল করলে উপহাসের পাত্র হওয়ার ভয় করে না। বড়রা অবশ্য সেই ভয় কাটাতে পারে না। কেন? কারণ তারা এমনভাবে বিদেশী ভাষা শেখার চেষ্টা করে, যা আনন্দদায়ক নয়। অন্যদিকে শিশুদের ভাঙা কিংবা শুরু করার মতো এমন কোনও অভ্যাস থাকে না। তাহলে শিশুরা কীভাবে ভাষা শিখতে পারে? তারা মূলত দেখে ও শুনে শিখে থাকে। আপনার প্রাত্যহিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তনটি আনতে হবে। অর্থাৎ নিয়মিত ঐ ভাষা শুনতে হবে এবং কিছু পড়তে হবে।

**৩. শব্দ ভাণ্ডার শেখা :** নতুন ভাষার নতুন শব্দ শেখা বেশ কঠিন বিষয়। বারবার দেখে, লিখে আর মুখস্থ করেও আয়ত্তে আনা যায় না। 'মেমোরাইজ' এর চিফ এক্সিকিউটিভ এড কুক বলেন, ভোকাবুলারী (শব্দভাণ্ডার) শেখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হ'ল পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো শেখা। অতঃপর পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। সরাসরি ব্যবহার সম্ভব না হ'লে অন্তত মনে মনে শব্দগুলো উচ্চারণ করুন।

**৪. নতুন শব্দ শিখতে চিরকুট ও ফ্ল্যাশকার্ড :** ধরুন, প্রতিদিন বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ছোট্ট একটা চিরকুটে বা মোবাইল নোটে ১০টি শব্দ লিখে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। লক্ষ্য ঠিক করলেন, নতুন এই ১০টি শব্দ আপনি আয়ত্ত করবেন। পথে যেতে যেতেই মনে মনে শব্দগুলো ব্যবহার করে বাক্য গঠন করুন। সারা দিনের ক্লাস বা কাজ শেষে ফেরার পথে আবার ঝালাই করে দেখুন, শব্দগুলো আপনার মনে আছে কি না। একইভাবে নতুন ভাষা শেখার সময় একটি চিরকুট বা মোবাইল নোট/ফ্ল্যাশকার্ড সবসময় আপনার বন্ধু হবে। ভাষা শেখার সময় আপনি যে সমস্যাযুক্ত শব্দভান্ডারের মুখোমুখি হন তারই ফ্ল্যাশকার্ড তৈরী করুন। এতে আপনার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।

**৫. বিদেশী ভাষার বই পড়ুন :** প্রচুর বই পড়ুন। বইয়ে থাকা শব্দগুলো নদীর মতো প্রবাহিত হবে। এটি সহজ কাজ নয়। তাই গল্পের বই দিয়ে পড়া শুরু করুন। কারণ এটি আপনার পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরী করবে। প্রথম মাসে শুধু ছোট গল্প

পড়ুন। শুধু পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এমনটা করুন। আপনি যদি পরিবর্তন করতে চান তবে অবশ্যই কমফোর্ট জোনের বাইরে কিছু করতে হবে। সুতরাং সমস্ত অলসতা ঝেড়ে আজ থেকে শুরু করুন!

**৬. সংবাদপত্র পাঠ করুন :** বিশ্বাস করুন, যদি আপনি ধারাবাহিকভাবে সংবাদপত্র পড়েন তবে এটি আপনার জন্য বিদেশী ভাষা শিখতে অনেক কাজে দিবে। কেননা সংবাদপত্রে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ঘটনা লেখা হয়। ফলে প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ বারবার ব্যবহার হয়। ফলে সেগুলো আয়ত্ত হয়ে যায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে আপনি নিজের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে শুরু করবেন। শুরুতে কিছুটা পানসে মনে হ'তে পারে। কিছুই বুঝতে পারছেন না এমন মনে হতে পারে। তবে পড়তে শুরু করার কিছুদিন পরই পড়ার আনন্দ বুঝতে পারবেন। নতুন নতুন শব্দ তো শিখবেন, সাথে সাথে ভাষার নানা ব্যবহারও আয়ত্ত করতে পারবেন।

**৭. শিশুদের বই পড়ুন :** যে কোনো দেশের শিশুদের বইতে স্মারকলিপি বা অক্ষরগুলো সাধারণত সহজবোধ্যভাবে লেখা হয়। যারা ভাষা শিখতে সবে শুরু করেছেন, তাদের জন্য এটা বেশ কার্যকর উপায়। কেননা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হয় শিশুদের সাথে কথা বলা ও শিশু সাহিত্য। ভাষা শিখতে চাইলে শিশুদের সাথে আপনার বেশী কথা বলা উচিত। কারণ শিশুরা সব সময় সরল ও সহজ শব্দ ভাণ্ডার দিয়ে তাদের ভাব প্রকাশের বাক্যগুলো সাজায়। তাছাড়া শিশুদের জন্য লেখা সাহিত্য পাঠ করেও আপনি ভাষার শব্দ ও বাক্য গঠনের কৌশলগুলো রপ্ত করতে পারেন।

**৮. লিখুন :** যে ভাষা শিখতে চাচ্ছেন, সে ভাষায় প্রতিদিন অল্প পরিমাণ হলেও লিখুন। নিজের পরিচয়, কী করতে পসন্দ করেন, কী কী খেতে ভালোবাসেন, আজ কী কী কাজ করবেন ইত্যাদি বিভিন্ন ছোট ছোট বিষয়ে লিখুন। আবার বন্ধুদেরকে ইমেইল বা মেসেজ করতে ও চিঠি লিখতে পারেন। এতেও লেখার চর্চা হবে। আস্তে আস্তে লেখার পরিমাণ বৃদ্ধি করুন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও আর্টিকেল লেখার চেষ্টা করুন।

**৯. জোরে বলার চেষ্টা করুন :** নতুন একটি ভাষায় কথা বলা অনেক কঠিন। কেননা শুধু শিখলে হয় না শেখার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ব্যবহারও করতে হয়। তাই প্রচুর চর্চা করতে হবে। আপনার যদি কোনো সঙ্গী না থাকে তাহলে যে ভাষা শিখতে চান, সে ভাষায় নিজেই জোরে জোরে নিজের সঙ্গে কথা বলুন। ভাষা শেখার সময় আপনাকে প্রতিটি বাক্য একেবারে ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই বলতে এমনটি নয়। কেননা শিশুরা তাদের কথা শেখার সময় অধিকাংশ বিশেষ্য বা নাম শব্দ দিয়েই প্রকাশ করে। যা অভিভাবকরা খুব সহজেই বুঝতে পারে। যেমন তারা পানি বললে, তাদেরকে পানি খেতে দেওয়া হয়।

**১০. অডিও বা ভিডিও রেকর্ড করুন :** যে কোন একটি বিষয় নির্বাচন করুন এবং আপনার নোটবুকে সেই বিষয় সম্পর্কে লিখুন। তারপর আপনি যা লিখেছেন তা দিয়ে আপনার ভিডিও রেকর্ড করুন। বলার আগে ভাবুন। না বুঝেই কোন কথা বলবেন না। প্রথমে থেমে মনে মনে ভাবুন এবং তারপর কথা বলুন। আপনি যখন বলার আগে চিন্তা করবেন, তখন মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে পারবেন। কী বললে ভুল হবে এবং কী বললে ঠিক তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। এভাবে প্রথমদিকে এক মিনিট বলতেই হয়তো কষ্ট হবে। তবে চর্চা করতে করতে তিন চার মিনিট বক্তব্য দিতে পারবেন।

এরপর আপনার করা অডিও বা ভিডিও রেকর্ডটি ভালো করে অনুসন্ধান করুন। বলার ক্ষেত্রে আপনি কোথায় কোথায় ভুল করেছেন। আপনার ভুলগুলো বিশ্লেষণ করুন। প্রতিদিন এভাবে করুন। তাহ'লে আপনি নিজেই নিজের ভুল ধরতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন কোথায় কোথায় আপনার আরো উন্নতি করতে হবে। এভাবে চর্চা করতে করতে দেখবেন আপনার নতুন শেখা ভাষায় বেশ সুন্দর ও সাবলীলভাবে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছেন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলবে। এই চর্চার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে যে কোন বিদেশী ভাষা রপ্ত করা সম্ভব।

**১১. অনুবাদকে অবহেলা নয় :** ভাষার নানা স্তরে নানা পদ্ধতি কার্যকর হয়ে ওঠে। কিছু পর্যায়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে শিখতে হয়, আবার কিছু অংশ মোটামুটি সহজেই শিখে ফেলা যায়। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির জার্মান ভাষা বিষয়ক শিক্ষক রেবেকা ব্রাউন বলেন, ভাষা শেখার যে কোন স্তরে যে কোন সমস্যা জয়ের মোক্ষম উপায়টি হ'ল অনুবাদ। তাই অনুবাদ করে নতুন শব্দ ও ভাষার অর্থ বুঝে বুঝে এগোতে থাকুন।

**১২. বাকপটুতায় ধ্যান দিন :** নতুন যে ভাষাটি শিখছেন তা হড়হড় করে না বলতে পারলেও অন্তত টানা বলে যেতে হবে। তাই আপনার বাকপটুতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য আপনাকে নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। অনেকে সব কিছু খুব দ্রুত শিখে ফেলতে চান। কিন্তু ভাষা এমন এক বিষয় যা শিখতে হবে সময় দিয়ে। কোন বিষয় না বোঝা পর্যন্ত তাতে সময় দিতে থাকুন। উচ্চারণে সহজ না হওয়া কথা বলতেই থাকুন।

**১৩. ভাষাভাষিদের সঙ্গে থাকুন :** যে ভাষা শিখছেন তা যাদের মাতৃভাষা অথবা যারা এ ভাষায় কথা বলতে পটু, তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। তাদের সাথে ঐ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করুন। এই উপায়ে আপনার দক্ষতা ব্যাপক বেড়ে যাবে।

**১৪. প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ করুন :** বর্তমানে আমরা প্রায় সবাই মোবাইল, ফোন, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকি। আপনার ভাষা শেখার কাজে এসব প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনি হয়তো ইংরেজী ভাষা শিখতে চান, তাহলে আপনি আপনার ফোনের লেখার

সেটিংস ইংরেজী করে রাখুন কিংবা মোবাইল বা কম্পিউটারের ভাষাই ইংরেজী করে রাখুন। এতে প্রতিদিন আপনি যত সময় কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার করবেন, তত সময় আপনার ইংরেজী ভাষা চর্চা হবে। এভাবে যে ভাষা শিখতে চান, কম্পিউটার ও মোবাইল সে ভাষায় রূপান্তর করে রাখুন। এতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদিকে আপনার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা হবে এবং পাশাপাশি আপনার ভাষা শেখার অনুশীলন করাও হয়ে যাবে।

**১৫. সংস্কৃতিকে ধারণ করুন :** বহু ভাষায় কথা বলতে পারা মানুষদের মতে, প্রত্যেকটি ভাষারই রয়েছে নিজস্ব একটা আচরণবিধি। কোনটা অনেক বেশী আন্তরিক, কোনটা তা নয়। আর তাই প্রত্যেকটি ভাষা কেবল কিছু অক্ষর বা শব্দ নয়, তুলে ধরে নতুন একটা সংস্কৃতি, নতুন মূল্যবোধ আর ভাবনা। অনেকে নতুন কোন ভাষা শিখতে গিয়ে এই ভিন্নতাটা আমলে নেন না। ফলে শেখার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তাই কোন ভাষা শেখার সময় এর ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকুন। অন্য কোন ভাষার সঙ্গে একদমই যেন মিশে না যায় সেটা খেয়াল রাখুন। সেই সঙ্গে ভাষাগুলো কেবল পড়ে বা শুনে রপ্ত করার চেষ্টা না করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করুন। মস্তিষ্ককে ভাষাটি শেখার কিছু স্মৃতি সংগ্রহের সুযোগ দিন। এতে করে খুব দ্রুত রপ্ত করতে পারেন ভাষাটি। সেই সঙ্গে সেটি বলার সময় মস্তিষ্কের কোণে জমে থাকা স্মৃতিগুলো আপনাকে সাহায্য করবে আরো ভালোভাবে, মাতৃভাষার মতো করে ভাষাটিকে প্রকাশ করতে।

**১৬. মাতৃভাষাকে আলাদা রাখুন :** মাতৃভাষা সবসময়ই আমাদের হৃদয়ের অনেক বেশী কাছের। অনেকে চান খুব তাড়াতাড়ি যেন অন্য ভাষাটিকেও মাতৃভাষার মতো করে বলতে পারা যায়। তবে সত্যিটা হচ্ছে এই যে, আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, মাতৃভাষায় যেভাবে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন অন্য কোন ভাষাতেই সেটা পারবেন না। রাশিয়ান লেখক ভ্লাডিমির নাবোকোভ নিজের জীবনী লিখতে গিয়ে প্রথমে ইংরেজীকে ভাষা হিসাবে বেছে নেন। পরবর্তীতে রাশান ভাষায় সেটাকে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি টের পান আরো অনেক কিছু বলার আছে তার, যেটা কিনা কেবল তার ভাষাতেই বলা সম্ভব। বিদেশী ভাষায় নয়। শেষ পর্যন্ত নতুন করেই একটা বই লিখে ফেলেন তিনি রাশান ভাষায় আর অনুবাদ করেন বিদেশী ভাষায়।

তাই বলে নতুন ভাষাকে রপ্ত করা ছেড়ে দিবেন সেটা নয়। চেষ্টা করুন মাতৃভাষাকে আলাদা করে রাখতে। যে ভাষাতে কথা বলছেন সেটার নিজস্ব সুরকে অনুসরণ করুন। লজ্জা পাবেন না। হয়তো আপনার নিজের কানে সেটা শুনতে প্রথমটায় একটু অদ্ভুত আর হাস্যকর শোনাবে। তবে মনে রাখবেন, আপনি যেটা হাস্যকর ভাবছেন, সামনের মানুষগুলোর কাছে সেটাই কিন্তু আসল উচ্চারণভঙ্গী।

**১৭. প্রতিদিন অনুশীলন করুন :** নতুন ভাষাটিতে দক্ষ হ'তে হলে আপনাকে প্রতিদিন অনুশীলন করতে হবে। একদিন অনেকক্ষণ অনুশীলন করে এক সপ্তাহ কিছু না করার চেয়ে প্রতিদিন ১০ মিনিট অনুশীলন করা শ্রেয়। অনুশীলনটি করবেন নতুন শেখা শব্দ, বাক্য আপনার প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের মাধ্যমে। যত অনুশীলন করবেন তত দ্রুত ভাষাটি আয়ত্ত করতে পারবেন। এজন্যই বলা হয় Practice makes a man perfect 'অনুশীলন একটি মানুষকে নিখুঁত করে তোলে'. এক্ষেত্রে যদি আপনি অনুশীলনের কোনো সঙ্গী পেয়ে যান, তাহলে আপনার ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমে যাবে অনেকাংশে। নাহ'লে আপনার উচিত হবে নিজের সাথে নিজেই অনুশীলন করা। প্রথমে শুধু ৫০ টি নতুন শব্দ শিখে নিন এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের ব্যবহার শুরু করুন। তারপর ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয়াদি। তাহ'লে তা আপনার জন্য যেমন কষ্টকর হবে না, তেমনি আবার একঘেয়েমিও হবে না। ঠিক Slow and Steady Wins the Race 'ধীরগতি এবং দৃঢ়রাই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়' প্রবাদটির মতো।

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাভেলনকো বলেন, কোন একটি ব্যাপার যদি আমাদের ভাষা শেখার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে স্থানীয়দের মতো করে দ্রুত বলতে চাওয়ার ইচ্ছা। আপনি অবশ্যই পারবেন স্থানীয়দের মতো স্বতস্ফূর্তভাবে নতুন ভাষাটিতে কথা বলতে। কিন্তু তার জন্য দরকার অনুশীলনের। আরেক বহুভাষাবিদ অ্যালেক্স রওলিং-এর মতে, প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট করে দিনে চারবার ভাষাটিকে অনুশীলন করা উচিত। কে না জানে, অনুশীলনের চাইতে ভালো এক্ষেত্রে আর কিছু হতেই পারে না!

**১৮. আয়নার সামনে অনুশীলন করুন :** বেশীরভাগ মানুষই নিজেকে এড়িয়ে চলে, নিজের মুখোমুখি হ'তে ভয় পায়। এ ধরনের মানুষের ক্যামেরা ভীতিও থাকে প্রবল। তাই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আপনি কীভাবে উচ্চারণ করছেন, আপনার অঙ্গভঙ্গি, হাসি ও শারীরিক ভাষাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে শিখুন। শুদ্ধভাবে ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারা অন্যতম যোগ্যতা। এটি রপ্ত করার চেষ্টা করুন।

**১৯. ভুলগুলো মেনে নেওয়া :** নতুন ভাষা শিখতে গেলে প্রথম দিকে আপনার অনেক ভুল হবে। সেই ভুল উচ্চারণ থেকে শুরু করে বানান সবক্ষেত্রেই হ'তে পারে। সেই ভুলগুলোতে ভেঙ্গে পড়লে বা লজ্জায় অনুশীলন থামিয়ে দিলে চলবে না। বরং আপনাকে ভুলগুলো শুধরিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। একটি নতুন ভাষা শেখা যতটা কষ্টসাধ্য, সেই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা ততটাই আনন্দের।

**২০. শেখার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনুন :** আপনি যা শিখছেন, নিত্য নতুন উপায়ে তা ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। যমজ দুই ভাই কম্পিউটারে, অ্যাপে বা বই পড়ে তুর্কি ভাষা শেখার পাশাপাশি তুর্কি রেডিয়ো স্টেশন, তুর্কি ভাষায় খেলার ধারাভাষ্য শোনা এগুলো নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। এর

ফলে ভাষার রকমারি ব্যবহার তাঁদের বোধগম্য হতে শুরু করে। কোন ভাষা শেখার বিশেষ কোন পদ্ধতি নেই। কোন শিক্ষকও আপনাকে কোন ভাষা গুলে খাইয়ে দিতে পারবেন না। কোন বিদেশী ভাষা জানা, বলা, পড়া ও লেখার জন্য চাই একাগ্রতা ও অনুশীলন। সেই অনুশীলনের জন্য নিত্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করুন। আর যান্ত্রিক সহযোগিতা পেতে অবশ্যই ইন্টারনেটের সুবিধা নিন। প্রায় প্রত্যেকের কাছে এটি সহজলভ্য হলেও, আমাদের বেশীরভাগই বিনোদনের জন্য নেটের ব্যবহার করে থাকেন। এর শিক্ষণীয় দিকটিও যে অপরিসীম, সেদিকে নযর দেন না।

**২১. ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ নিন :** নিজের টার্গেট পূরণের ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত বা মোটিভেশন খুব যরূরী। ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেও এটা করা যেতে পারে। যমজ দুই ভাই-ও গোটা সপ্তাহ ধরে প্রচুর ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ নিতেন। প্রথম দিন একজন টার্কিশ বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে তাঁর ভাষাতেই তাঁকে আপ্যায়নের চেষ্টা করেন তাঁরা। এরপর একে একে ফল ও সংখ্যার তুর্কি প্রতিশব্দ শিখে তুরস্কের বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করার চেষ্টা করেন। আপনিও এধরনের চ্যালেঞ্জ নিন।

**২২. অবসরকে কাজে লাগান :** অবসরে কী করতে ভালোবাসেন আপনি? বই পড়তে, আড্ডা দিতে কিংবা ঘুরতে যেতে? তাহলে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সিইও ডেভিড বেইলির ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখার পদ্ধতিটি কাজে লাগতে পারে আপনার। ডেভিড সেবার ছুটিতে ১৭ দিনের জন্য ফ্রেঞ্চ বন্ধুর সঙ্গে তার গ্রামে বেড়াতে যান। সঙ্গে নিয়ে যান ফ্রেঞ্চ গল্পের কিছু বই। এরপর? টানা ১৭ দিন ফ্রেঞ্চ ভাষার বই পড়ে সেখানকার দৈনন্দিন জীবন যাপন করে বেশ ভালোভাবে ভাষাটিকে আয়ত্তে এনে ফেলেন। কী ভাবছেন? সামনের ছুটিতে কী পরিকল্পনা করছেন তাহলে?

**২৩. আত্মবিশ্বাস রাখুন :** এতকিছুর কোনটাই কোন কাজে আসবে না যদি না আপনি বিশ্বাস করেন যে আপনি পারবেন। আর তাই নিজের ওপর আস্থা রাখুন। ভাবছেন বয়স বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? একদমই না! সম্প্রতি হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বয়স্করা ভাষা সংক্রান্ত নিয়মের ক্ষেত্রে ছোটদের চাইতে অনেক বেশী ভালো বোঝেন। এছাড়া একটা ধারণা থাকলেও পুরোপুরিভাবে কেউ এখনো সরাসরি বয়স বাড়ার সঙ্গে ভাষা শেখার ক্ষমতা কমে যাওয়ার সম্পর্ক দেখাতে পারেনি। সুতরাং, নিজেকে বলুন, আমি পারব। আর এগিয়ে যান নতুন ভাষার জগতে খুব সহজেই।

**শেষ কথা :** কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। অন্তত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি সত্য। উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো আপনার কতটা কাজে আসবে তা নির্ভর করে আপনি ভাষাটি শিখতে কতটা আগ্রহী তার উপর। আপনার প্রবল আগ্রহ থাকলে আপনি নিজেই নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবেন। আপনার ইচ্ছাশক্তি ও চর্চার উপরেই নির্ভর করে আপনি কত দ্রুত ও ভালোভাবে ভাষাটি রপ্ত করতে পারবেন। মনে রাখবেন চেক প্রবাদটি– Those who know many languages live as many lives as the languages they know.

*[লেখক : শিক্ষার্থী, ৩য় বর্ষ, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]*


# হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

**আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!**

**বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net**

**সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board**

# ড. ভি আব্দুর রহীম

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

*[ড. ভি আব্দুর রহীম একজন ইণ্ডিয়ান ভাষাবিদ ও গবেষক। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি সুদানের উম্মে দুরমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাশাপাশি আরবী ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। এছাড়া ১৯৯৫ সাল থেকে মৃত্যু অবধি তিনি মদীনার বিখ্যাত কুরআন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কিং ফাহাদ কমপ্লেক্সের অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরবী, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সীসহ প্রায় ১৪টি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরবী, ইংরেজীসহ কয়েকটি ভাষায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত দুরূসুল লুগাতিল আরাবিয়াহ ও মদীনা আরবী রিডার বই দু'টি সারা বিশ্বের আরবী ভাষার শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। আরবী ভাষা ও অনুবাদ সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৬ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন।]*

**জন্ম ও পরিচয় :** ড. ভি. আব্দুর রহীম ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ভানিয়ামাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেকারণ তাঁর নামের শুরুতে জন্মস্থানের প্রথম অক্ষর ভি লেখা হয়। ইংরেজী ও আরবীতে একে ফানিয়ামাবাদী বলা হয়। ফলে তিনি এই দুই ভাষায় নিজের নাম লিখতেন ড. এফ. আব্দুর রহীম।

**শিক্ষা জীবন :** শায়খ আব্দুর রহীম নিজ গ্রামের মক্তবে কুরআন ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি ফানিয়ামাবাদি শহরের মুহাম্মাদিয়াহ এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অধিভুক্ত ইসলামিক স্কুলে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আরবী ভাষা বেছে নেন এবং পুরোপুরি নিজের তত্ত্বাবধানে তা পড়েন। তবে মুখস্থনির্ভর এমন ভাষা শেখার পদ্ধতি তাঁর পছন্দ ছিল না। ফলে নিজ ভাষাজ্ঞানকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি কায়রো থেকে প্রচারিত নিদাউল-ইসলাম এবং মক্কা থেকে প্রচারিত ভয়েস অফ দ্য আরব রেডিও অনুসরণ করতেন। তখন থেকেই তিনি ভাষা শেখার আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেন।

ড. ভি আব্দুর রহীম ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৬১ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর অর্জন করেন। এসময় তিনি আরবী ভাষা বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছাত্র নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরায় আরবী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

আরব দেশগুলোতে উচ্চতর পড়াশোনার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রবলভাবে জেঁকে বসে। ফলে তিনি মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জামাল আবদেল নাসেরকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য একটি চিঠি লিখেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসাইন আশ-শাফীর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। যেখানে লেখা ছিল- আমি তাকে তার অনুমোদনের কথা জানাচ্ছি এবং তাকে ভিসা পাওয়ার জন্য নয়াদিল্লিতে মিশরীয় দূতাবাসে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। অতঃপর ১৯৬৪ সালে তিনি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে আরবীয় ফার্সী শব্দ (অর্থাৎ ফার্সী ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ) বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন।

১৯৭৩ সালে তিনি আরবী ভাষা অনুষদের তৎকালীন ডীন ড. ইব্রাহীম আবু নাজার তত্ত্বাবধানে আরবী ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল ইমাম আবুল মানছূর আজ-জাওয়ালীকীর গ্রন্থে আরবী শব্দসমূহ। তিনি সেখানে অভিধানের অক্ষর বিন্যাস অনুসারে অনারবীয় বাক্যে আরবী শব্দসমূহের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেন। তিনি ১৪টি প্রাচ্য এবং আন্তর্জাতিক ভাষাসহ প্রচুর সংখ্যক ভাষা এবং উপভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তার মধ্যে আরবী, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী, হিন্দী, তামিল, ফার্সী, জার্মান, গ্রীক, তুর্কী, হিব্রু, আরামাইক (সিরিয়ান), সংস্কৃত, এবং এস্পেরান্তো উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আরবী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

**কর্মজীবন :** ড. ভি. আব্দুর রহীমের কর্মজীবন ছিল শিক্ষা জীবনের ন্যায় বর্ণাঢ্য। মিশরে যাওয়ার পূর্বে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইংরেজী ভাষার প্রভাষক হিসাবে প্রায় এক বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালের পর তিনি সুদানের উম্মে দুরমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাশাপাশি আরবী ভাষা

ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে দীর্ঘ ২৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি মাস্টার্স, পিএইচডিসহ আরবী ভাষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন। আরবী ভাষা শিক্ষার প্রসারে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, কানাডা, পাকিস্তান, ভারত, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের নানা দেশে তিনি আরবী ভাষা কোর্সের দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষতঃ জার্মানীতে তিনি প্রায় ১০ বছর অবস্থান করেন। এছাড়া তিনি ইন্দোনেশিয়ায় রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৯৫ সালে ড. ভি. আব্দুর রহীম মদীনার বিখ্যাত কুরআন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কিং ফাহাদ কমপ্লেক্সের অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে এই কমপ্লেক্স থেকে বিশ্বের ৭৭টির অধিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে আরবী ভাষায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন।

**তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য আরবী গ্রন্থসমূহ :**

১. আদ-দাখীল ফিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীছাহ ওয়া লাহজাতিহা।
২. আল-কওলুল আছীল ফীমা ফীল আরাবিয়্যাহ মিনাদ দাখীল।
৩. সাওয়াউস সাবীল ইলা মা ফীল আরাবিয়্যাহ মিনাদ দাখীল।
৪. মু'জামুদ দাখীল ফিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীছাহ ওয়া লাহজাতিহা।
৫. সিহরুল আলহায ফী শি'রুল আলফায।
৬. আল-বাহিছু আনিল হক্ব (সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর হাদীছ : ভাষাগত বিশ্লেষণ)।
৭. ফী বালাদি হিরাকল (আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর হাদীছ : ভাষাগত বিশ্লেষণ)।
৮. আরবাঊনা হাদীছান লি তা'লীমীল লুগাহ আল-আরাবিইয়াহ ওয়াত তারবিয়াতিন নববিইয়াহ।
৯. আল-মুসইফ ফী লুগাতি ওয়া ইরাবি সূরাতি ইউসুফ।

**তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গ্রন্থসমূহ :**

১. Europe Speaks Arabic.
২. I Am Proud to Be a Muslim.
৩. Selections From the Glorious Quran.
৪. From Esphahan To Madina in Search of Truth.
৫. Both These Lights Emanate From the Same Niche.

**অনারবদের আরবী শিক্ষার জন্য তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :** (১) দুরূসুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ লিগাইরিন নাত্বিকীনা বিহা (আরবী ভাষায় ৩ খণ্ড)। (২) মিফতাহু দুরূসিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ লিগাইরিন নাত্বিকীনা বিহা (ইংরেজী ভাষায় ৩ খণ্ড)। (৩) মুজামুল কালিমাতিল ওয়ারিদাহ ফী দুরূসিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ লিগাইরিন নাত্বিকীনা বিহা।

**মৃত্যু :** ড. ভি. আব্দুর রহীম ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন জুমআর পর মসজিদে নববীতে তাঁর জানাযা হয় এবং বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।-আমীন!


# দারুস সুন্নাহ বুক শপ

**স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম**

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

**বি:দ্র:** কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

**আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর**



বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব'** *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

# আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

## ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

**সম্মানিত সুধী!**

**'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

**স্তর সমূহের বিবরণ**

| স্তরের নাম | মাসিক কিস্তি | বার্ষিক | স্তরের নাম | মাসিক কিস্তি | বার্ষিক |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৩০০০/= | ৩৬,০০০/= | ৬ষ্ঠ | ৪০০/= | ৪,৮০০/= |
| ২য় | ২৫০০/= | ৩০,০০০/= | ৭ম | ৩০০/= | ৩,৬০০/= |
| ৩য় | ২০০০/= | ২৪,০০০/= | ৮ম | ২০০/= | ২,৪০০/= |
| ৪র্থ | ১০০০/= | ১২,০০০/= | ৯ম | ১০০/= | ১,২০০/= |
| ৫ম | ৫০০/= | ৬,০০০/= | ১০ম | ৫০/= | ৬০০/= |

**অর্থ প্রেরণের মাধ্যম**

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
**বিকাশ, নগদ ও রকেট :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
**বিকাশ :** ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

**বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!**

# পিটার শ্যুট (জার্মানী)-এর ইসলাম গ্রহণ

জার্মান সাংবাদিক ও লেখক পিটার শ্যুট। জন্ম ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর। বেশ কয়েকটি বইয়ের রচয়িতা ও সাবেক কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তার বেশ পরিচিতি রয়েছে। লেটস গো ইস্ট, ব্ল্যাক পয়েন্স ও জার্নি টু সাইবেরিয়া ইত্যাদি তার আলোচিত বই। সামাজিক কার্যক্রমে তিনি বেশ কর্মোচ্ছল ও সক্রিয়। সংবাদ মাধ্যমকে পিটার জানিয়েছেন, মুসলমান হওয়ার জন্য তাকে কেউ কখনো চাপ দেয়নি। বরং শৈশব থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত ছিলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও নিজের সদিচ্ছায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের সংক্ষিপ্ত গল্প পাঠকদের জন্য অনুবাদ করে দেওয়া হ'ল।

**সত্যের সন্ধানে বহুদূর :** জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় আমি ব্যয় করেছি, সত্য ধর্মের সন্ধানে। আমার জন্ম লুথেরান পরিবারে। বয়স যখন উনিশ, তখন আমি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। কারণ আমি আমার লুথেরানীয় পরিবারের সংকীর্ণতা থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছিলাম। তখন আমার অনেক বেশি আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল। এটাই ছিল আমার জীবনে সত্যের পথে যাত্রার মাধ্যম। কারণ আসলেই এটি আমার জীবনের ফারাক-ফাটল আমাকে বুঝিয়ে দেয়। এর ত্রিশ বছর পরে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। তবে ইসলাম গ্রহণ আমার জীবনে কোনো ফাটল-বিচ্ছেদ তৈরি করেনি। বরং এটি ছিল আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি অর্জনের জন্য আমার অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফলাফল।

**ইসলামী প্রার্থনার নিয়ম-নীতি পর্যবেক্ষণ :** সত্যি বলতে কি, আমি খুব ছোট থেকেই ইসলামের প্রতি মুগ্ধ ছিলাম। আমি যুদ্ধোত্তর জার্মানির একটি ছোট্ট গ্রামে বড় হয়েছি। আমরা জার্মানির যে অংশে বাস করতাম, সেটি ব্রিটিশদের দখলকৃত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারত থেকে আগত সৈনিকরা মুসলমান ছিলেন। তারা এখানকার বাচ্চাদের প্রতি খুব সদয় ও দয়ার্দ্র ছিলেন। তারা আমাদের খেজুর ও ডুমুর ফল ইত্যাদি খেতে দিতেন। তাদের প্রার্থনা পর্যবেক্ষণে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম। ইসলামী রীতিতে ছালাত-প্রার্থনার শৈশব স্মৃতি আমার সঙ্গে এখনো বয়ে বেড়ায়।

**মক্কা নগরী ও হজ্জযাত্রার প্রতি আমার আগ্রহ :** আমাদের গ্রামের কাছেই একটি প্রাচীন গির্জা ছিল। তাতে আমি খ্যাতিমান জার্মানদের দেখেছিলাম, যারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী ছিল। চার্চের যাজক আমাকে সেই বিখ্যাত জার্মানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ কার্স্টেন নিবুহরের কথা বলা যায়, বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যোথে তাকে প্রথম জার্মান হাজী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই গল্পগুলো আমার হৃদয়-উদ্যান উত্তেজনা ও কৌতূহলে পূর্ণ করে দেয়। আমি 'মক্কা' নামক বিশেষ জায়গাটি সম্পর্কে ও লোকেরা কেন সেখানে পৌঁছানোর জন্য দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে তা সম্পর্কে আমি বেশ অবাক ও অনুসন্ধিৎসু ছিলাম।

**মুক্তির ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার :** বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় আমি ইসলামের সংস্পর্শে এসেছি। এসময় আমি প্রাচ্যের শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছি। ছাত্রাবাসে ইরান, মিশর ও নাইজেরিয়ার মুসলিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমি একই ঘরে থাকতাম। ধর্ম-বিশ্বাস ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা অনেক রাত কাটিয়েছি। ক্যাম্পাসে আন্তঃ-ধর্মীয় সংলাপ ফোরামের আয়োজনও করেছি। সেই সময়ে আমি ইসলামকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মুক্তির ধর্মতত্ত্ব হিসেবে দেখতে পেয়েছি। আমি তখন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলাম এবং ছাত্র-বিদ্রোহে অংশও নিয়েছিলাম।

**আমার মসজিদটি যেখানে :** শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। হামবুর্গের আলস্টারের নিকটে ইসলামিক কেন্দ্রটি আমার মসজিদে পরিণত হয় তখন। এটি তখন এবং এখনও একটি আধুনিক মসজিদ হিসেবে পরিচিত। এটি কেবল ইবাদতের স্থান নয়; বরং বিভিন্ন বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও কার্যক্রমেরও স্থান। আন্ত-ধর্মীয় সংলাপ ও আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ঘটনালির অন্যতম। বিশ্বের আলোচিত ও নন্দিত বক্তারা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে এই কেন্দ্রে আসতেন। ঠিক তেমন এখানে একজন আসেন, যার নাম মেহেদী রাজভি। তিনি আমার এমন শিক্ষক ছিলেন যে, আমাকে ইসলামের প্রতি পরিচালিত করেছিলেন।

**ধর্ম রূপান্তর ও সত্যিকার মুসলিম হ'তে :** শেষ সিদ্ধান্ত নিতে আমার জীবনের অর্ধেক সময় কেটে গেছে। এখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এটি পুরোপুরি একটি নতুন পথে আমার যাত্রা। আপনি একবার কালেমা শাহাদাত পাঠ করলে এবং ইসলাম গ্রহণের অর্থ বলতে পারলে, আপনি মুসলমান হয়ে যাবেন। তবে আপনার সারাটা মন-মস্তিষ্ক ও প্রাণ দিয়ে সত্যিকারের মুসলমান হ'তে চাইলে প্রতীকী-বিশ্বাসের উচ্চারণের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। একজন সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার জন্য দীর্ঘকালীন অনুশীলন ও শিক্ষা-প্রক্রিয়া প্রয়োজন। প্রতিটি দিন আপনাকে নতুন করে শুরু করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও অধ্যবসায়। কোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। আমি মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করিনি। আর আমাকে কেউ মুসলমান হওয়ার জন্য চাপও দেয়নি। রাতেও (অগোচরে) আমি ইসলামে দীক্ষিত হইনি। বরং সত্য খুঁজে পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ ছিল এটি। যদি আল্লাহ চান, আমি জীবনের প্রতিটি দিন কাটিয়ে সত্যের আরও নিকট থেকে নিকটতর হ'তে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

# দুর্বলতাই যখন শক্তি

-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

*[গল্পটি পাঠের পূর্বে জুডো খেলা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জুডো একটি আধুনিক মার্শাল আর্ট। একে প্রাচীন মল্লযুদ্ধ ও কুস্তির আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে। ১৮৮২ সালে (মতান্তরে ১৮৮০ সালে) জাপানী শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ড. জিগারো কানোর হাত ধরে এই খেলার উৎপত্তি হয়। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে এটি অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়। জুডো খেলায় খেলোয়াড়দের লক্ষ্য থাকে প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলে দেওয়া এবং আঁকড়ে ধরে অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। এই খেলায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেকারণ মুখমণ্ডলসহ শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অংশে আঘাত করা খেলার নিয়ম বহির্ভূত। জুডো খেলোয়াড়দের জুডোকা ও কোচ বা প্রশিক্ষকদের সেনসি বলা হয়।- অনুবাদক]*

দশ বছর বয়সী একটি ছেলে জুডো খেলার জন্য মনস্থ করল। কিন্তু সমস্যা হল এক বছর আগে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সে তার বাম হাতটি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে জুডোর সব কৌশল পুরোপুরি আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য সে একজন জাপানী সেনসির নিকট জুডো প্রশিক্ষণ শুরু করল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে জুডোর প্রাথমিক নিয়মাবলী ও প্রতিরক্ষা কসরত ভালোভাবে রপ্ত করে নিল। এরপর তিন মাস যাবৎ সেনসি তাকে কেবল একটি উচ্চ আক্রমণ কৌশল প্রশিক্ষণ দিল। সে বুঝতে পারছিল না কেন সেনসি বারবার তাকে কেবল একটি চালই শেখাচ্ছিল। একদিন সে প্রশ্ন করে বসল, সেনসি! আমি কি আর কোন চাল শিখব না? উত্তরে সেনসি তাকে বললেন, এই একটি চালই ভালোভাবে রপ্ত কর। এটির কারণেই তুমি প্রসিদ্ধি লাভ করবে। এটিই একমাত্র কৌশল যা তোমার সব সময় প্রয়োজন হবে। ছেলেটি সেনসির কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু সে তার কথায় বিশ্বাস রেখে প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেল। অবশ্য এ ছাড়া তার অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কারণ হাতকাটা ছেলেকে জুডো শেখানোর মত পণ্ডশ্রম কে করতে চায়!

কয়েক মাস টানা প্রশিক্ষণের পর সে একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করল। দেখা গেল, মাত্র একটি কৌশল জেনেও ছেলেটি প্রথম দুই পর্বে সহজে জয় লাভ করল। এমন অভাবনীয় সাফল্যে ছেলেটি নিজেই অবাক হয়ে গেল। তবে তৃতীয় পর্বে ছেলেটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখী হল। কিছুক্ষণ তুমুল লড়াইয়ের পর তার প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ধৈর্য হারিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তখনই ছেলেটি তার একমাত্র চাল প্রয়োগ করে জয়লাভ করল এবং চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হ'ল। টুর্নামেন্টের বিজয়ের মালা তার থেকে মাত্র এক ম্যাচ দূরত্বে। এমন উত্তরোত্তর সাফল্যে ছেলেটির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর হয়ে ছেলেটি ফাইনাল খেলা শুরু করল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারল, সে এবার অধিকতর শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করছে। এক পর্যায়ে মনে হ'ল, ছেলেটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তার পক্ষে আর বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব না। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ তার ক্ষতির আশংকা করছিল। তথাপি সে হাল ছাড়ল না। এমনকি খেলার মধ্য বিরতির সময় রেফারী তাকে পরাজয় মেনে নিয়ে খেলা শেষ করার প্রস্তাব দিল। তখন তার সেনসি বললেন, তাকে খেলা চালিয়ে যেতে দিন। বিরতির পর খেলা আবার শুরু হ'ল। ছেলেটি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে শুধু প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল। সেনসি অধীর আগ্রহে কেবল একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় একটি ভুল করে বসল। সাথে সাথে ছেলেটি নিখুঁতভাবে তার একমাত্র চালটি প্রয়োগ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। এক হাত না থাকা সত্বেও ছেলেটি একটি পুরো টুর্নামেন্ট জিতে গেল।

ফেরার পথে ছেলেটি বিস্ময়ের সাথে তার সেনসির সাথে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল। এক পর্যায়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, সেনসি! কেবল একটিমাত্র চাল শিখে আমি পুরো টুর্নামেন্ট কীভাবে জিতে গেলাম? এটা কীভাবে সম্ভব হ'ল? সেনসি বললেন, তুমি দু'টি কারণে জয় লাভ করেছ। এক. তুমি জুডোর সবচেয়ে কঠিন চালগুলোর মধ্যে একটি রপ্ত করেছ এবং তুমি তা খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পার, যা অনেক বড় খেলোয়াড়রাও নিখুঁতভাবে পারে না। ফলে তোমার অধিকাংশ প্রতিপক্ষ বিশেষ করে প্রথম দুই পর্বের খেলোয়াড়রা এটা ধারণাও করতে পারেনি। দুই. তোমার শেখা এই চালটি প্রতিহত করার সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতি হ'ল আক্রমণকারীর বাম হাত ধরে তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু তোমার বাম হাত কাটা সেহেতু প্রতিপক্ষ তোমার এই চাল প্রতিহত করতে সক্ষম হয়নি। ছেলেটি বুঝতে পারল, তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতাই এখন তার সবচেয়ে বড় শক্তি। সে মহৎ পরিকল্পনাকারী আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল।

**শিক্ষা :** কখনো কখনো আমরা নিজেদের দুর্বলতা দেখে বিচলিত হয়ে নিজ তাক্বদীরকে দোষারোপ করি। কখনো আবার প্রতিকূল পরিস্থিতে সামান্য সীমাবদ্ধতার কারণে হতাশায় নিমজ্জিত হই। কিন্তু আমরা জানিনা, এ দুর্বলতাই কোন একদিন আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি রূপে আবির্ভূত হ'তে পারে। এটি আল্লাহ্‌র মহৎ পরিকল্পনারই অংশ। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই নিজেকে কখনও অক্ষম ভাবা উচিত নয়। বরং নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করাই কর্তব্য। এর মাধ্যমেই একদিন চূড়ান্ত সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ!

*[গল্পটি আরবী থেকে অনূদিত]*

# আমার শ্রেষ্ঠ মা

-আব্দুল কাদের

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মা অনেকটা সামরিক কায়দায় আমাদের শাসন করতেন। তখন মনে হ'ত এ কেমন স্বৈরশাসন! কিন্তু তার ঐ শাসনের সুফল আজ প্রতিটি মুহূর্তে টের পাই। যখনই নিজের কোন সফলতার সংবাদ পাই তখনই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মায়ের দৃঢ়চিত্ত প্রচেষ্টার কারণেই আমাদের আজ এই অবস্থান। হৃদয়ের গভীর থেকে আমার শ্রেষ্ঠ মাকে অনুভব করি। দৌড়ে গিয়ে তাকে সফলতার সুসংবাদ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পড়েই ক্ষান্ত হয়ে যাই, 'রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছগীরা'।

একবার কোন এক কারণে মায়ের প্রতি আমি খুবই রাগান্বিত হয়ে তার কথার প্রত্যুত্তর করি। কোথায় যাই! মা তো রেগে আগুন। বুঝতে পারলাম কী ঘটতে যাচ্ছে। আমি ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেলাম। যাওয়ার পথে তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, 'আজ রাতে বাড়িতে আসতে পারবি না'। বুঝলাম আমার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। এ তো আর কোন দেশের আইন না, যে কারো ওকালতি বা সুফারিশ চলবে। এ আইন মায়ের মোবাইল কোর্টের আইন। সন্ধ্যা হ'ল। কিন্তু ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারছি না। এমন পরিস্থিতিতে দাদী পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি কোন সমস্যা না হওয়ার অভয় দিলেন। কিন্তু কোনভাবেই নিজেকে মানাতে পারছিলাম না। কারণ, মা যতই রাগী হোন না কেন, রাতে তিনিই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন।

যাইহোক ভাবছি মা যদি আর কোনদিন না ডাকেন। যদি বাড়িতে না উঠতে দেন! নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুধু এপিঠ-ওপিঠ করছি। এক পর্যায়ে আর সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করলাম। আর নির্লজ্জের মত মা মা করে ডাকতে শুরু করলাম। আমার কান্নার আওয়াজে যেন তিনি তার দেহে প্রাণ খুঁজে পেলেন। তার বুঝতে বাকী নেই তার ভালোবাসা কঠোরতার ঊর্ধ্বে। তারপরও তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। যেন আমি দ্বিতীয় বার এধরনের ভুল না করি। এজন্য তিনি বললেন, ঘরে উঠতে হ'লে ওয়াদা করতে হবে, দ্বিতীয়বার আর কখনো যেন এমন ভুল না হয়। আমি সাথে সাথে রাযী হয়ে গেলাম।

মনে পড়ছে, মা নবীদের কাহিনী থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে তার ভাইদের নির্মমতার ঘটনা, ইসমাঈল (আঃ)–কে তার বাবা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী করতে যাওয়ার ঘটনা ইত্যাদি গল্প শুনাতেন। তিনি পড়তেন আর আমি গভীর আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। প্রতিটি রাত ছিল একটা নতুন কিছুর সাথে পরিচয়, একটা নতুন এপিসোড।

আমাদের থালা-বাসন পরিষ্কার থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তিনিই দিতেন। আমরা দুই ভাই যখন ছোট, তখন মা আমাদের ছালাত শিক্ষার বিষয়ে খুবই তৎপর ছিলেন। সাধারণত দিনের বেলায় মসজিদে গিয়ে ছালাত পড়তে সমস্যা হ'ত না। আবার ফজরের ছালাতে আব্বাই সাথে নিয়ে যেতেন। কিন্তু সমস্যা ছিল এশার ছালাতে। তাই মা তখন একটি হারিকেন নিয়ে আমাদেরকে মসজিদের দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য গেট পর্যন্ত আসতেন। আমরা দু'জন মসজিদে গিয়ে চিৎকার দিতাম যে, আমরা পৌঁছে গেছি। তখন দেখতাম ঐ আলোটা আস্তে করে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেছে। আমরা বুঝতাম মা ভিতরে চলে গেছেন। এরপর ছালাত শেষ হলে আবার আমরা মা বলে ডাক দিতাম। দেখতাম একটা আলো বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। বুঝতাম মা চলে এসেছেন। আসলে তিনি আমাদেরকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতেন। এরপর ঐ আলোকে লক্ষ্য করে আমরা দু'জনে দৌড় দিতাম।

ফজরের ছালাতের পর আব্বা-মা দু'জনই কুরআন ও হাদীছ পড়তে বসতেন। আমাদেরও পাশে বসাতেন। আমরা কুরআন পৃথক পৃথক পড়ার চেষ্টা করলেও হাদীছ একজনই পড়তেন আর বাকিরা শুনতাম। আর হাদীছ পড়তেন মা। কারণ মায়ের পড়া ছিল স্পষ্ট আর আব্বার পড়া ছিল অস্পষ্ট। ফলে আব্বা পড়লে মা প্রায়ই ভুল ধরতেন। যে কারণে আব্বা মায়ের সামনে পড়ার ঝুঁকি নিতেন না। তবে ব্যাখ্যা করতেন আব্বা। এদিক দিয়ে আব্বা মায়ের থেকে উপরে ছিলেন। আর এটা মাও মেনে নিতেন। আবার কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে আব্বা ছিলেন মায়ের উস্তাদ।

যাইহোক মক্তবে পাঠানোর পাশাপাশি মা নিজেও আমাদের কুরআন ও ছালাত শিক্ষা দিতেন। আর এভাবেই তিনি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেন। যেহেতু তখন আমাদের কোন বোন ছিল না। আবার আব্বাও সকালে বাজারে যেতেন। আর রাতে ফিরতেন। তাই মাকেই বাড়ির সকল কাজ করতে হ'ত। আর এ কারণেই তিনি সকালে আমাদের বিছানা, টেবিল, আলনার কাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে দিয়ে বলতেন, রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত যেন এমনই থাকে। আর আমরাও যথাসম্ভব তা পালন করার চেষ্টা করতাম, পাছে যদি ভ্রাম্যমাণ আদালতে শাস্তি হয়ে যায়!

ছোট বেলায় নিয়মিত আর একটু বয়স হ'লে বিশেষ দিনে তিনি আমাদের গোসল করাতেন। আর ঐদিন আমাদের পাতিলের মত অবস্থা হ'ত। না কান্না করা পর্যন্ত ঘষাঘষি চলত। কান্না ছিল তার মানদণ্ড। অর্থাৎ কাঁদলে তিনি বুঝতেন কাজ হয়েছে। অন্যদিকে স্কুল, মাদ্রাসা, আত্মীয়বাড়ি ইত্যাদি জায়গায় যাওয়ার সময় তার নির্ধারিত ড্রেস বা ফ্যাশনই ছিল একমাত্র ফ্যাশন। এমনকি চিরুনি পর্যন্ত তিনি নিজে করে দিতেন। তিনি আমাদের ছোট-বড় সকল কাজ শেখাতেন।

খাওয়ার আদব থেকে শুরু করে বড়দের সাথে ব্যবহার। হাতের নখ কাটা থেকে রোদে কাপড় শুকানোতে যে একটা সৌন্দর্য আছে তাও তিনি শেখাতেন। এ বিষয়ে তিনি আব্বাকে প্রায়ই কথা শুনাতেন। ঘরের আসবাবপত্র প্রতি ৩/৪ মাস পরপর স্থানান্তর করতেন। তাতে যেন এক নতুনত্ব প্রকাশ পেত। অর্থাৎ তিনি একজন রুচিশীল বা সৌন্দর্যপ্রেমী ছিলেন। নিজেরা নিজেদের জিনিস ঠিকমতো গুছিয়ে রাখার পাশাপাশি তাকেও তার কাজে আমরা সাহায্য করতাম।

সন্ধায় একটা নৈমিত্তিক কাজ ছিল হারিকেন মোছা ও ঘর-বারান্দা ঝাড়ু দেওয়া। আমি একটা করলে ভাই করত অন্যটা। রান্নার আগে ও পরে তাকে সাহায্য করতাম। একটু বড় হলে নিজেদের কাপড় নিজেরাই পরিষ্কার করতাম। এভাবে তিনি আমাদেরকে যেমন পরিষ্কার থাকার শিক্ষা দিতেন, তেমন স্বনির্ভরতার শিক্ষাও দিতেন। যার ফল এখন পদে পদে উপলব্ধি করি।

তিনি ছিলেন একজন বুনন শিল্পী। হয়তো এটি তিনি পেয়েছেন তার মায়ের কাছ থেকে অর্থাৎ আমার নানীর কাছ থেকে। কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে প্রায় সব সেলাই তিনি পারেন। আমরাও তার থেকে এর কিছু শিখতে ভুল করিনি। এক্ষেত্রে তিনি আমাদের উস্তাদ। তিনি একজন ডাক্তার বা হাকীম। যে কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হ'লে তিনি মানসিক সান্তনা থেকে শুরু করে ঔষধি খাবার, ঔষধ ও ডাক্তারের খোঁজ করার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। আমার এখনো মনে পড়ে জ্বর হলে মা কলসের তলায় ছিদ্র করে তাতে পাটকাঠি দিয়ে লাইন করে দিতেন, যার ফলে কলসে ভরা পানি আস্তে আস্তে মাথায় এসে পড়ত। এ যেন এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আবার ঠাণ্ডা লাগলে রাতে তেল দিয়ে পা মালিশ করে দিতেন।

তিনি ছিলেন সকল কাজের কাযী। বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে মাঠে, বাজারে জমি ক্রয় পর্যন্ত উদ্যোগ তিনি নিতেন বা আব্বার প্রস্তাবে তিনিই সবচেয়ে বেশী সাহস যোগাতেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তিনিই ছিলেন অগ্রবর্তী। মা যদি বলতেন এ কাজটা তিনি করবেন তাহ'লে ধরে নিতে হবে কাজটি হয়ে গেছে। কারণ যত রাতই হোক তিনি ঐ কাজটা না করে ঘুমাতে যেতেন না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মা ছিলেন আমার দেখা শ্রেষ্ঠ আপোষহীন মহিলা। অন্যায় করে ফেললে আব্বা পর্যন্ত ভয়ে থাকতেন। এ বিষয়ে নানা বাড়িতেও তার নাম ডাক আছে। কিন্তু আব্বার প্রতি তার ছিল অগাধ ভক্তি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভয়। আমি খেয়াল করে দেখতাম, বাসায় যখন ভালো কিছু রান্না হ'ত, মা তখন আব্বার জন্য আগেই কিছু রেখে দিতেন। মা বলতেন, তিনি সারাদিন বাইরে থাকেন, অনেক কষ্ট করেন, আবার সবার শেষে খান। তাই তার জন্য ভালোটা না রাখলে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। আবার আব্বার ময়লা কাপড় যদি পরিষ্কার করতে ভুলে যেতেন আমাদের সামনে বলে বসতেন 'তোর আব্বা আমাকে যে কী বলবে'!

**মায়ের স্বপ্ন :** মা স্বল্পশিক্ষিতা হওয়ার কারণে তার স্বপ্ন সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলবেন। তার এই স্বপ্ন পূরণের জন্য বড় ভাইকে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে পাঠালেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর হলেও যে দিন বড় ভাই পড়ালেখার জন্য বাইরে গেলেন, সেদিন থেকে তিনি আমার প্রতি দুর্বল হ'তে শুরু করলেন। আর তখন থেকে তিনি আমার প্রতি কিছুতা সহনশীল হ'তে থাকেন। হয়তো তিনি আমাকেও ছেড়ে দেওয়ার জন্য দিন গুণতেন।

যাইহোক আমিও যখন বাড়ি ছাড়লাম, তখন মা মানসিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন। যখন আমি বাড়িতে যাওয়ার দিন বলতাম, তখন থেকে মা দিন গুণতে থাকতেন। তার সমস্ত দুঃখ যেন শেষ হয়ে যেত। আর যেদিন আমি ফিরে আসার দিনটি বলতাম, সেদিন থেকে তার মুখটা মলিন হয়ে যেত, আবার অসুস্থতা, দুঃখ-চিন্তা তাকে ঘিরে ধরত।

বাড়ি থেকে শহরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, দাদী, ফুফু অনেকেই বিদায় দিতে আসতেন। আসার সময় দেখতাম তার পাশ থেকে একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখের দিকে তাকালেই দেখতাম তার চোখ অশ্রুসিক্ত। কিন্তু বুঝতে দিতে চাইতেন না। চোখে যেন কিছু পড়েছে এমনটি বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

মাকে শেষবার দেখার পর আমিও আমার চাপা কান্না ঠেকাতে পারতাম না। মনের অজান্তেই চোখ লাল হয়ে যেত, বেয়ে পড়ত অশ্রু। আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতাম। কারণ তিনি আমাকে কাঁদতে পাঠাননি, জয় করতে পাঠিয়েছিলেন! চলে আসার পর আমার ফেলে আসা জিনিসগুলো, পড়ার চেয়ার, টেবিল, কখনো বা আমার সাথীদের দেখে তাদের কাছে ছুটে চলে যেতেন। কিন্তু পিছন থেকে কেউ যেন বলত তোমার ছেলে ঐখানে নেই। তখন অশ্রুসিক্ত হয়ে ফিরে আসতেন না পাওয়ার বেদনা নিয়ে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কোন এক অজানা বিষন্নতা কাজ করে। আমার সমস্ত ব্যস্ততা শেষে করে বাড়ী গেলেও তার সাথে সাক্ষাত হয় না। আমার জন্য কেউ অপেক্ষাও করে না, দিনও গুণে না। মোবাইলে কল দিয়ে বাবা বলে কেউ ডাকও দেয় না। বাড়ী থেকে বিদায়কালে আমার হাতে-কপালে কেউ চুমুও খায়না। মসজিদের মিনারে আযানের সুর ভেসে আসলেই মনে হয়, মা আমাকে এসে বলবেন, বাবা তাড়াতাড়ি টুপি-পাঞ্জাবি পরে মসজিদে যাও। কিন্তু এমনটি হয়না। তবে মায়ের শেখানো অভ্যাসের কারণেই অবচেতন মনে মসজিদ পানে ছুটে চলি। এশার ছালাত শেষে যখন ফিরে আসি, তখন মনে হয় বাড়ী থেকে একটি আলো বের হয়ে আসবে। কিন্তু এমনটি আর হয় না।

এখন প্রতি ছালাতে তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। আদর্শ সন্তান হিসাবে তার কবরে আমল পৌঁছানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। সাথে সাথে মৃত্যু অবধি দ্বীনের সঠিক পথে চলতে পারি সেই কামনা করি। আল্লাহ সকলকেই যেন তাওফীক দান করেন।- আমীন!

*[লেখক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]*

# সংগঠন সংবাদ

## যুব সমাবেশ ২০২৪

**নওদাপাড়া, মারকায ২৩ শে ফেব্রুয়ারী'২৪ শুক্রবার :** অদ্য বাদ সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর ৩৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের স্বাগত ভাষণের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। (১) মুহাম্মাদ আল-আমীন (বগুড়া) (২) হায়দার আলী (মেহেরপুর) (৩) কায়েদ মাহমূদ ইমরান (বরিশাল) (৪) দেলাওয়ার হোসাইন (নরসিংদী) (৪) ইকবাল হোসাইন (ভোলা) ও (৫) তোফায়েল আহমাদ (সিলেট)। এরপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার এবং সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। উক্ত সমাবেশের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুল আলীম (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা-দক্ষিণ) ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ইয়াকুব আলী (সহ-সভাপতি মেহেরপুর যেলা) এবং সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ।

### জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪ (অনলাইন)

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে অনলাইনে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত তরজমাতুল কুরআন (১-১৫ পারা)।

বয়স ও পেশা নির্বিশেষে উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিন জন হ'লেন (১) মুহাম্মাদ আবু তালহা (নওগাঁ) (ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায) (২) আতীকুর রহমান যাকারিয়া (নওগাঁ) (ছাত্র, নবম শ্রেণী, মারকায) ও (৩) ইমতিয়ায আহমাদ (রাজশাহী)।

অতঃপর বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ'লেন (১) মতীউর রহমান (রাজশাহী) (২) জাহিদ হাসান (কুমিল্লা) (৩) গাযী সুমাইয়া জান্নাতী (রাজবাড়ী) (৪) বাদশা ইসলাম (কুড়িগ্রাম) (৫) মাহফূযুর রহমান (নওগাঁ) (৬) মুছাদ্দেক হোসাইন (দিনাজপুর) (১০ম শ্রেণী, মারকায) (৭) মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান (রাজশাহী) (৮) মা'রূফা খাতূন (রাজশাহী) (ছাত্রী, দাওরায়ে হাদীছ, বালিকা শাখা, মারকায) (৯) জাহাঙ্গীর হোসাইন (সাতক্ষীরা) ও (১০) মাহফূয আলম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার 'যুব সমাবেশে'র মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ। উল্লেখ্য যে, এ সময় 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীরকেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ উপলক্ষ্যে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

### প্রশিক্ষণ

**খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা ১৩ই ফেব্রুয়ারী'২৪ মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ মাগরিব খয়েরসূতি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফারের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সোহরাব আলী। এছাড়াও উক্ত প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

### মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

**চামুরখান, রফিজ উদ্দিন সড়ক, উত্তরখান, ঢাকা ২রা মার্চ'২৪ শনিবার :** অদ্য বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত বায়তুল হামদ জামে মসজিদ চামুরখানে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা হয়। দারুস সালাম আস সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসার পরিচালক আব্দুর রাশেদ সালাফীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মুফতি আব্দুর রহমান পরিচালক, মাদ্রাসা দিয়ার আল মাদিনা। হাফেয ইব্রাহীম, ইমাম ও খতিব, মোহাম্মদী জামে মসজিদ, চামুরখান, উত্তরখান, ঢাকা প্রমুখ।

### পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

**নওদাপাড়া, মারকায ৫ই মার্চ'২৪ মঙ্গলবার :** অদ্যবাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অস্থায়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার উদ্যোগে 'তাওহীদের ডাক জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী-২০২৪' সংখ্যার কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার সভাপতি হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'ল, ১ম স্থান নাহিদ হাসানা (৯ম), ২য় স্থান মোস্তাক আহমেদ মুঈন (৮ম) এবং ৩য় মোছাদ্দেক হোসাইন (১০ম)।

# শব্দজট

**উপর-নীচ :** ১. ইসলামের ২য় যুদ্ধ। ২. ফরয ব্যতিরেকে অতিরিক্ত ইবাদতকে যা বলা হয়। ৪. রাসূলের নাম শুনলে যা পাঠ করা হয়। ৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় শত্রুদের সাথে যে লড়াই। ৭. রাসূলের একটি খচ্চরের নাম। ৮. রাসূলের এক চাচার নাম। ৯. বহু নবীর নিকট আল্লাহ যে গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। ১১. দয়ার সমর্থক শব্দ।

**পাশাপশি :** ১. ইসলামের ৩য় খলীফার নাম। ৩. দাদা আব্দুল মুত্তালিবের রাখা শেষনবীর নাম। ৫. রাসূলের জন্য যেই মাকামের প্রার্থনা আযানের দো'আ করা হয়। ৬. নবী-রাসূলদের নিকট যিনি অহি নিয়ে আসেন। ৮. রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিকে যা বুঝানো হয়। ১০. ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। ১২. রাসূলের শহরের নাম।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | | ৩ | | | ৪ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ৫ | | | |
| | | | | ৭ | | | | |
| | ৬ | | | | | ৮ | | ৯ |
| | | | | | | | | |
| ১০ | | ১১ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ১২ | | | | | | |

**প্রতিযোগীর নাম :** .....

**শ্রেণী :** ..... **শাখা :**.....

**মোবাইল :** .....

**প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :**.....

.....।

**গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর :**

* মারকায ১. মেহমান ২. রহমত ৩. দরকার ৪. হযরত

**গত সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হলেন, ১ম** আল-মুনতাহিম, মারকায (বালক শাখা); **২য়** উম্মে সাইমা, মারকায (মহিলা শাখা); **৩য়** মুহাম্মাদ রিফাত আলী (বালক শাখা)।

**(১)** নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৬৬-২০১৩৫৩।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ নাম্বারে হোয়াটসআপ করতে হবে।

**সতর্কীকরণ :** কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

# সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : ২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক উন্মোচিত নতুন বাংলা ফন্টের নাম কী?
উত্তর : পূর্ণ।

২. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে মোট বনভূমির আয়তন কত?
উত্তর : ১৫.৫৮% (জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে)।

৩. প্রশ্ন : ২০২২-২৩ সালের মাথাপিছু GDP কত?
উত্তর : ২,৬২,৮৬৮ টাকা।

৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার সঙ্গে ডলার বিনিময় বা সোয়াট ব্যবস্থা চালু করে কবে?
উত্তর : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪।

৫. প্রশ্ন : দেশের ৪৬তম নদীবন্দর কোনটি?
উত্তর : সুলতানগঞ্জ নদীবন্দর, রাজশাহী।

৬. প্রশ্ন : বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মেট্রোরেল চালু হয়?
উত্তর : ৬০তম।

৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের মালিকানাধীন রাবার বাগান কতটি?
উত্তর : ১৮টি।

৮. প্রশ্ন : স্বাক্ষরতার হারে সর্বনিম্ন যেলা কোনটি?
উত্তর : বান্দরবান।

# সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনীর নাম কী?
উত্তর : বর্ডার গার্ড পুলিশ।

২. প্রশ্ন : মালয়েশিয়ার বর্তমান রাজা কে?
উত্তর : ইব্রাহীম সুলতান।

৩. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (ICJ) নতুন প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : নাওয়াফ সালাম (লেবানন)।

৪. প্রশ্ন : গাযায় ইসরায়েলের গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) মামলা করে কোন দেশ?
উত্তর : দক্ষিণ আফ্রিকা।

৫. প্রশ্ন : ২০২৪ সালের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন কে?
উত্তর : ১. ওয়ায়েল হাল্লাক। ২. মোহাম্মাদ সাম্মাক। ৩. জেরি মেণ্ডেল, ৪. হাওয়ার্ড ইউয়ান, ৫. হাও চ্যাং।

৬. প্রশ্ন : চাঁদে সফলভাবে নাভোযান পাঠানোয় পঞ্চম দেশ কেনটি? উত্তর : জাপান।

৭. প্রশ্ন : কোন দেশে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ঝুলন্ত মসজিদ উদ্বোধন করা হয়?
উত্তর : সৌদী আরব।

৮. প্রশ্ন : স্থলভাগে প্রথম ক্ষুদ্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : রাশিয়ায়।

# কুইজ

১. প্রশ্ন : ড. ভি আব্দুর রহীম কতটি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন?

উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : আল-ফারাবী কতটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন?

উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ কতটি?

উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : নোমোফোবিয়া এর পূর্ণরূপ (ইংরেজী) কি?

উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কত মাস পূর্বে বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : Practice makes a man perfect অর্থ কি?

উত্তর :.....।

৭. প্রশ্ন : স্যার সৈয়দ আহমদ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর :.....।

৮. প্রশ্ন : মাইয়েতের সাথে কবরে কয়টি জিনিস যায়?

উত্তর :.....।

**প্রতিযোগীর নাম : .....**

**শ্রেণী : ..... শাখা : .....**

**মোবাইল : .....**

**প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....**

**.....**

**.....।**

**গত সংখ্যার উত্তর :** ১. ইউনুস নবীকে ২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১ ৩. জাযান প্রদেশ ৪. ইরাকের ৫. মা'লূমাত ৬. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ৭. Favoritism. Nopotism. ৮. ১৮৭৫ সাল ৯. চল্লিশ রাত্রের ১০. হাজ্জাজ।

**গত সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হলেন :**

**১ম** জুমানা নুসাইবা, ৫ম শ্রেণী (মারকায, মহিলা শাখা);

**২য়** মুহাম্মাদ আবু ছায়িম, মাহাদ-২ (মারকায, বালক শাখা);

**৩য়** মুসাম্মাৎ ফাতেমা (দিনাজপুর)।

**নির্দেশনা :** কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

# সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে শহীদ দুই বৃদ্ধের নাম কি?
উত্তর : হযরত ইয়ামান ও ছাবিত বিন ওয়াক্বশ (রাঃ)।

২. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীর ঝুলে পড়া চোখ রাসূল যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিলে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও দৃষ্টিশক্তি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়?
উত্তর : ক্বাতাদাহ বিন নু'মান (রাঃ)-এর চোখ।

৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-কে হামলাকারী উবাই বিন খালাফকে মারার জন্য কে বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন?
উত্তর : হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ্ (রাঃ)।

৪. প্রশ্ন : আনাস বিন নাযারের শরীরে কতটি যখম ছিল?
উত্তর : ৮০টির অধিক যখম লেগেছিল।

৫. প্রশ্ন : যুদ্ধ শেষে কোন ছাহাবীর সন্ধানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন ছাবিতকে পাঠান।
উত্তর : সা'দ বিন রবী'-এর সন্ধানে।

৬. প্রশ্ন : সা'দ বিন রবী'-এর শরীরে কতটি যখম ছিল?
উত্তর : ৭০-এর অধিক।

৭. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কোন দু'জন শহীদ এক ওয়াক্তও ছালাত আদায় করেনি?
উত্তর : 'আমর বিন ছাবিত আল-উছায়রিম ও আমর ইবনু উক্বাইশ।

৮. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে লড়াই করেও জাহান্নামী কারা?
উত্তর : 'কুযমান' ও হারেছ বিন সুওয়াইদ বিন ছামেত।

৯. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কাকে উত্তম ইহূদী বলেছেন?
উত্তর : মুখাইরীক্বকে।

১০. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীকে ল্যাংড়া শহীদ বলা হয়?
উত্তর : 'আমর ইবনুল জামূহকে।

১১. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হামযা (রাঃ)-এর সাথে কাকে একই কবরে দাফন করা হয়?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শকে।

১২. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীর কাফনের কাপড়ে কমতি হ'লে ইযখির ঘাস দিয়ে পা ঢাকা হয়?
উত্তর : মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর।

১৩. প্রশ্ন : কে মুছ'আবকে রাসূল ভেবে হত্যা করেছিল?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন ক্বামিআহ লায়ছী।

১৪. প্রশ্ন : ওহোদ থেকে ফেরার পথে রাসূল (ছাঃ) কোন গোত্রের মহিলাদের কান্নার রোল শুনতে পেয়েছিলেন?
উত্তর : বনু আব্দিল আশহাল ও বনু যাফর গোত্রের।

১৫. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কোন মহিলা তার স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদাতের খবর শুনে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন?
উত্তর : 'আমর ইবনুল জামূহ্র স্ত্রী হিন্দ নাম্মী।

১৬. প্রশ্ন : মদীনার প্রথম ওয়াকফকৃত ভূমি কোনটি?
উত্তর : 'মুখাইরীক্বের সাতটি খেজুর বাগান।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

# ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

**আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ**

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

**আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :**

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

**বিঃ দ্রঃ**

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।



# সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

অর্ডার করুন
✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

Rain RM Man

AN EXCLUSIVE COLLECTION FOR GENTS

Director

Muhammad Habibur Rahman (Habib)

Al-sami shopping complex, monipur, gazipur sadar. 01732-224778, 01721-937785

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মার্চ-এপ্রিল ২০২৪ মূল্য : ৩০ টাকা


## হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত যুবকদের জন্য সংস্কারমূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বই

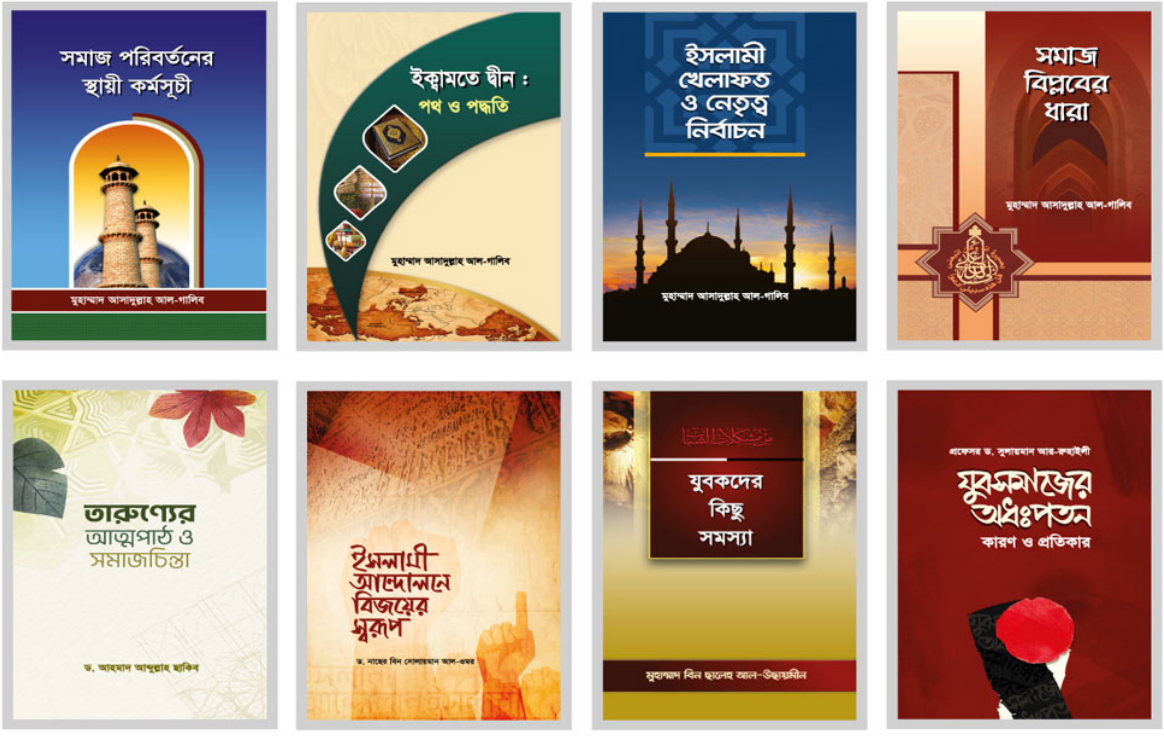


অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*।

২০০ মি.লি
মূল্য : ৬০০ টাকা

খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন
০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহ্হার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গাযীপুর